মঙ্গলাচরণ।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥

বেদের প্রধান নিত্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে।
এই তত্ত্ব গুরুদেব লভি তব স্থানে॥
ঊনচত্বারিংশ বর্ষ হইল বিগত।
এখনো নিরখি সেই পূরব পর্ব্বত॥
অভ্রভেদী দেবতাত্মা অত্যুচ্চ মহান্।
যাহা হৈতে বিকাশে বিজ্ঞান-অংশুমান্॥
ভাতিল সমস্ত বিশ্ব জাগিল ভারত।
মর্ত্ত্যে দেখি অমৃতের দিব্য মুক্তপথ॥
"সংসার-তিমির অন্তে জ্যোতির আধার।
সত্য শিব পরব্রহ্ম অনন্ত অপার॥"
কৃ[illegible]কর মহাগুরো এ ভিক্ষা চরণে।
এই মন্ত্র জপি যেন জীবনে মরণে॥

১৭২৩ শকাব্দ। ১১ই মাঘ।

প্রথম প্রস্তাব।

কর্ম্ম বিবরণ।

ঈশান চন্দ্র বসু

ভূমিকা।

বাঙ্গালীজাতি "মুখসর্ব্বস্ব" বলিয়া নিন্দার ভাজন হইতেছেন। এই নিন্দার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গালীদিগের কৃত বহু সৎকর্ম্মের প্রত্যাশা করায়ায়; তাহাতে ক্রুটি হয় কেন? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসিগণ এবং-প্রকার প্রত্যাশার বস্তু কত দিন? তাহা ৮৫ বৎসরের অধিক হইবে না। যে একমাত্র পুরুষ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমাদের নবাভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থা হইতে আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছেন, যাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বঙ্গবাসিগণ সুসভ্যজনোচিত সমস্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার মহত্ত্বমণ্ডিত মূর্ত্তি এখনো আমাদের চক্ষুর গোচর রহিয়াছেন। তবে আমরা ধর্ম্মোৎসাহ ও কর্ম্মশীলতা হারাইব কেন?

যৌবনাস্তে এই মহাত্মা যে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তখনি শত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে সেই তীর্থাভিমুখে তাঁহার অনুযাত্রী হইতে দেখাগিয়াছিল। পরে বঙ্গের মুখোজ্জলকারী সহস্র সহস্র সৎপুরুষ তাঁহার পথে চলিয়াছেন। ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ সাধুশীল ব্যক্তি এই পথে পুণ্যতীর্থে গমন করিবেন। এই সকল সদাশয় লোক

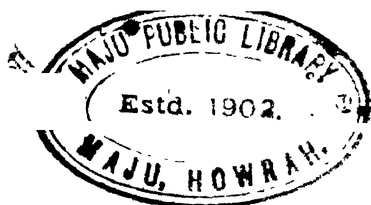
চলিতে চলিতে ভগ্নোদ্যম অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়েন, এনিমিত্ত আলোকস্তম্ভ স্বরূপ এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত সম্মুখে বিধৃত রাখা কর্ত্তব্য।

ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বৃহত্তর পুস্তক সকল রচিত ও প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ সুশিক্ষিত বঙ্গবাসীদিগের জ্ঞানগুরু উক্ত মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতার অবসর বহিয়া না যায়, এবং তাঁহার উপদেশের প্রতি মনোযোগের শৈথিল্য না হয়, ইহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধ ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসের সমীরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষাংশে কিঞ্চিৎ সংযোগ বিয়োগ এবং কয়েক স্থলে টীকা নিয়োগ পূর্ব্বক এই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।

১৮২৩ শকাব্দ, ১৩০৮ সাল, ১১ই মাঘ।





শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ ইহার জন্ম হয়। এ সময়ে এ দেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চায় যে নবযুগের অবতারণা হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার উত্তরসাধক। অতএব সেই প্রসঙ্গে ইহার জীবন চরিত্রের আলোচনা করিলে সুসঙ্গত হয়।

যখন দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ৪ মাস পূর্ব্বে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০জানুয়ারী কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রকরণে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইবার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল।

প্রথমে হিন্দু কলেজের "মহাবিদ্যালয়" নাম ছিল। জন্মাবধি বা জন্মপ্রসঙ্গাবধি এই বিদ্যালয় নানা প্রকার "গ্রহবৈগুণ্য" ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ইহার জন্ম-স্থানে যে সকল কর্ত্তা বা গ্রহের অধিকার ছিল, তাঁহারা কখনই সদ্ভাবে একমত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন নাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে হইতে বারম্বার সভা হয়। ২৭শে আগষ্টের সাধারণ

সভায় এই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হয়। তাহার পাঁচ মাস পরে উহার কার্য্যারম্ভ হয়।

এত দিন ধরিয়া উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ হইতেছিল, তাহার মধ্যে প্রধান তর্ক আমরা এই জানিতেছি যে,রামমোহন রায়কে এই বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে রাখা যায় কি না? স্থির হইল—"না।" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উহার প্রতিষ্ঠাতাগণ আপনাদিগকে নিষ্কণ্টক জ্ঞান করিলেন। ইংরাজী, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাসমন্বিত মহাবিদ্যালয়ের কার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল।

পরন্ত এই বিদ্যালয়ের দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হইবে না, ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা ডেবিড্ হেয়ার পর বৎসর (১৮১৮ অব্দে) "স্কুলসোসাইটী" নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার তত্ত্বাবধানে কতকগুলি পাঠশালা ও স্কুল স্থাপিত হয়।

এই সকল বিদ্যালয়ের হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞানান্ধতার দোষ না বুঝিতেন, এমন নহে; অতএব তাঁহারা সুশিক্ষার প্রচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তথাপি ইঁহাদের অন্তঃকরণে যে অজ্ঞান-কালিমা ছিল, তাহার ফল সর্ব্বাংশে শুভজনক হইবে না, ইহা বিশুদ্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন রামমোহন রায়ের অগোচর ছিল না। রাম-

মোহন স্বদেশীয় লোকদিগের যতটুকু সৎকার্য্য দেখিতে পান, তাহাতেই আনন্দানুভব করিতেন।

এই বিদ্যালয়রূপ পুত্র সকলের পিতৃস্থানীয় ডেবিড্ হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন। মহাত্মা রামমোহন সেই বন্ধু দ্বারা যথাসম্ভব এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি পক্ষে সুপরামর্শ প্রদান করিতেন। তিনি এইরূপে স্কুল প্রকরণের কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া স্বদেশীয়দিগকে তৎপক্ষে নির্দ্বন্দ্ব করিয়া দিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইয়াছিল,—ধর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত সুশিক্ষা প্রচারের কি উপায় হয়?*

"ধর্ম্মজ্ঞান সমন্বিত সুশিক্ষা প্রচারের বাহুল্য হউক", —ইহা রামমোহন রায়ের এক অন্তঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা।

* এই চিন্তায় রামমোন রায় ১৮২২ অব্দে আপনার আয়ত্ত মতে এক স্কুল স্থাপন করেন। তাহা বহুবৎসর চলিয়াছিল। এই স্কুলে ইতিহাসাদি সহ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার এক পরিদর্শক, আদম সাহেব, ১৮২৭ অব্দে একস্থলে লিখিয়াছিলেন:—

"Two teachers are employed, one at a salary of 150 Rs. per month, and the other at a salary of 70 Rs. per month; and from 60 to 80 Hindu boys are instructed in the English language. The doctrines of Christianity are not inculcated, but the duties of morality are carefully enjoined, and the *facts* belonging to the history of Christianity are taught to those pupils who are capable of understanding general history."

ঈশ্বর সে প্রার্থনা শুনিলেন। ১৮১৬ অব্দের ২৭শে আগষ্ট, যখন রামমোহন রায়কে ত্যাগ করিয়া হিন্দু কলেজের অনুষ্ঠাতৃগণ ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন শিক্ষাপ্রচারের নিয়মাবলি অবধারণ করিলেন, * সেই সময় রামমোহন রায়ের প্রার্থনার ফলস্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ গর্ভস্থ হইয়াছিলেন। দশ মাস পার এই শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। রামমোহন রায়ের এই বান্ধবপুত্র অতি শৈশব বয়সেই তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে আপনার ভবিষ্য কর্ম্মের সূচনা করিয়াছিলেন। †

হিন্দু কলেজে বা মহাবিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান হইতেছিল, তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। নাস্তিকতার বাত্যায় কলেজ সমূলে আন্দোলিত হইল। এত যত্নের বিদ্যাবৃক্ষের এই বিষম বিকৃত ফল দর্শন

---

* Rules of the Hindu College.—I. The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian language and in the literature and science of Europe and Asia.

David Hare, by Peary Chand Mittra, Appendix A.

† শুনাযায় রামমোহন রায় এই শিশুকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই শিশু আমার স্থান অধিকার করিবে।

করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহনের অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথা জন্মিয়াছিল। *

১ এক্ষণে রাজোপাধিধারী রামমোহন ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার নয়নানন্দকর দেবেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া কি কয়েকটী কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার গম্ভীর ভাব এবং নিয়ত প্রার্থনা-

* রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়াও তাঁহার এই মনোব্যথা ও আক্ষেপ ভুলিতে বা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার তত্রত্য জীবনচরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন।—

"In his younger years, his mind had been deeply struck with the evils of believing too much, and against that he directed all his energies ; but, in his latter days, he began to feel, that there was as much, if not greater, danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education, had learnt to reject their own faith without substituting any other. These he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."

Biography of Raja Ram Mohun Roy : London, 1833-34.

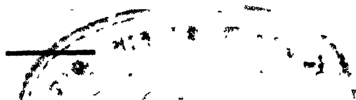
বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে হিন্দুসমাজের আবহমান-কাল-প্রচলিত রীতিনীতি বিচলিত হইবে, এই আশঙ্কায় কলেজের অধ্যক্ষগণ কলেজের ছাত্রদিগের পক্ষে ধর্ম্মচর্চ্চা করা দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র নাথ ঐ কার্য্যের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পক্ষে এই সভা কোন কার্য্যেরই হইল না। তাঁহাকে ধর্ম্মচর্চ্চা নিমিত্ত এক পৃথক্ সভার সৃষ্টি করিতে হইল।

জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা ২০০ সভ্য লইয়া মহাড়ম্বরে কলেজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা আপাততঃ তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কারণ, অতি অল্পমাত্র অকৃতবিদ্য সভ্য সমেত এই সভার অধিবেশন ও জ্ঞানালাপন তাঁহার নিজ বাটীর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে সাধিত হইত। প্রতি মাসে এই সভার বৃহৎ অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মত বক্তৃতা পাঠ করিলে তাহার এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইত। *

---

* অতি অল্প সংখ্যক সভ্য লইয়া এমন নিভৃতভাবে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার শ্রীশচন্দ্র রায়, এবং কলিকাতার বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভবানীপুরের শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মহামান্য ধনী, বিদ্বান্ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

"তত্ত্ববোধিনী" নাম এবং এই সভার আলোচিত উপনিষদাদির বিষয় চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথ ধর্ম্মজ্ঞানৈষণায় এক স্বতন্ত্র পুরুষ। এরূপ কথিত আছে যে, তিনি এক দিবস উপনিষদ্ গ্রন্থের এক ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহার অর্থবোধ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট গিয়া উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এই সাধনা ও সিদ্ধি কিয়ৎকালের কর্ম্মফল নহে। তাঁহার স্বভাবোদিত ব্রহ্মজ্ঞান কখন নক্ষত্র-খচিত আকাশ দর্শনে, কখন শ্মশানক্ষেত্র-প্রবাহিত বৈরাগ্য গীত শ্রবণে, কখন বা উপনিষৎ পাঠে অতি সহজেই আত্মার মধ্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি কৃতবিদ্য অকৃতবিদ্য সকল প্রকার লোককে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। যাঁহার যতদূর সাধ্য, তিনি তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অংশভাগী হইতেন। সকল লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ করা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের বিষয় ছিল। ইহা তাঁহার এক বিশেষত্ব।



তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ।

তত্ত্ববোধিনী সভাস্থাপনের ২ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্র নাথ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভাব গতি জানিয়াছিলেন। ইহার পরে দুই বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত প্রবীণ লোকদিগের উদ্দেশ্য ও চেষ্টার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এই চারি বৎসরে পূর্ব্বোক্ত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বলাধান হইল; দেবেন্দ্র-নাথেরও কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। ১৭৬৩ শকে এই শুভ সম্মেলন হয়।

বিষয় কর্ম্ম।

এখন দেবেন্দ্র নাথের বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। এই পঞ্চ বিংশ বৎসর ধরিয়া দেবেন্দ্র নাথ যে কেবল জ্ঞান ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়াছেন, বিষয় কর্ম্ম কিছু করেন নাই, তাহা নহে। তিনি যে মহাপুরুষের সন্তান, তাঁহার পৃথিবী জুড়িয়া কর্ম্ম। তাঁহার অনন্ত বিষয় ব্যাপারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। খৃঃ ১৮৩৪

'অন্দে দ্বারকা নাথ ঠাকুর চাকুরী সম্বন্ধে মহোচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন উদ্দেশে 'কার, ঠাকুর এবং কোম্পানি' নামে এক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথকে সেই কুঠিতে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এবম্বিধ আরো কোন কোন কর্ম্ম এবং জমিদারী ব্যাপার শিক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পিতার উপযুক্ত সুপুত্র হইতে পারিলেন, সংসারের সহিত কার্য্য করিতে জানিলেন, এবং পার্থিব বিষয়-ভার বহনের যোগ্যতা লাভ করিলেন; কিন্তু কিছুতে বদ্ধ হইলেন না। স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুরাগ প্রভাবে তিনি এই জটিল বিষয় জালের মধ্যে নির্লিপ্ত রহিলেন। অথবা ইহা বলিতে পারা যায় যে, সুদীর্ঘ জীবনকাল তিনি ঘোর বিষয় সংস্পর্শে থাকিয়াও কেমন অনাসক্ত ভাবে ঋষিধর্ম্ম পালন করিবেন, প্রথম যৌবনে তিনি তাহারই পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

এপর্য্যন্ত যাঁহারা সুশিক্ষিত বা দেশানুরাগী বলিয়া পরিচিত হইতেন, তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়ে ইংরাজদিগকে আদর্শ ও নেতা বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইংরাজসংসর্গ এদেশীয় সাধারণ লোকের কোন দিনই তৃপ্তিজনক হয়

নাই। এই জন্য ১৮১৭ অব্দে যখন হিন্দুকলেজ স্থাপন হয়, ১৮১৮ অব্দে যখন স্কুল সোসাইটী দ্বারা পাঠশালা সকল স্থাপন হয়, ১৮৩৫ অব্দে যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়, সেই সেই সময় সাধারণ লোক ঐ সকল দেশহিতানুষ্ঠানের নিন্দাবাদ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ১৮৩৯।৪০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত হইল। খৃষ্টীয় মিশনরিগণ গ্রামে গ্রামে কত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু লোকেরা ঐ হিতানুষ্ঠান-কারীদিগের প্রতি একপ্রকার সন্দিহান-চিত্ত হইয়াছিল।

এমন অবস্থায় তত্ত্ববোধিনী সভা কলিকাতায় এবং পল্লীগ্রামে নূতন প্রকরণে পাঠশালা সকল-স্থাপনের উপক্রম করিলেন। পূর্ব্বে সমাজদ্রোহিতার ভয়ে এ দেশীয়েরা সুশিক্ষার নামে নিরীশ্বর বিদ্যা শিক্ষার বিস্তার করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ নিঃসঙ্কোচে উপনিষদাদি শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ের পুস্তক, অধ্যাপক ও অধ্যয়ন প্রণালীতে যে যে ত্রুটি থাকুক, ইহা খাঁটি দেশীয় জিনিষ, এই খ্যাতিতে দেবেন্দ্রনাথের এই নবোদ্যম জয়যুক্ত হইতে লাগিল।*

* তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৭৬২ শকে প্রথমে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই মহানগরীতে ইংরাজী-প্রধান অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছিল। সুসাধু বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র

পাঠ্যপুস্তক।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের পূর্ব্বে এদেশের পাঠ্য-পুস্তক গুলি প্রায়ই ইংরাজদিগের দ্বারা লিখিত বা অনুবাদিত অথবা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা ঠিক ইংরাজীর আদর্শে সঙ্কলিত হইত। ভাষার জটিলতায় ও কদর্য্যতায় সে গুলি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য বোধ হইত। তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা সে দোষ বিদূরিত হইল।

এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। পুস্তকগুলির নাম করিলেই বর্ত্তমান কালের লোকেরা তাহার প্রকৃতি চিনিয়া লইতে পারিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্বের পুস্তক—

১। পুরুষ পরীক্ষা। ২। পশ্বাবলী। ৩। মার্শমেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৪। ফর্গসন সাহেবের লিখিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা—শ্রীযুক্ত যাতি সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ৫। শ্রীযুক্ত

এবং তাহার সহিত ইংরাজী শিক্ষা হয়, এই প্রণালীতে পাঠশালা চালাইবার নিমিত্ত তত্ত্ববোধিনী সভা ইহাকে স্থানান্তরিত করা উচিত বিবেচনা করিলেন। তদনন্তর বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রাচীন স্থান বংশবাটী গ্রামে ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ এই পাঠশালা নূতন ভাবে স্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং (সুপ্রসিদ্ধ) শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ ইহার পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিদ্যাদান করা হইত।

যাতি সাহেবের কৃত পদার্থ বিদ্যাসার। ৬। শ্রীযুক্ত জানমাক সাহেব কৃত কিমিয়া বিদ্যাসার। ৭। রাজাবলি। ৮। কীথ সাহেবেয় কৃত বঙ্গভাষা ব্যাকরণ। ৯। জ্ঞানার্ণব।

তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যে রচিত পুস্তক অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি।

শেযোক্ত পুস্তক সকল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় অধ্যাপনার নিমিত্ত রচিত হইয়া প্রথমে তথায় অধীত এবং পরে ১৭৬৩ শকে মুদ্রিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষা।

ক্ষণজন্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যেন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর বিশেষ কৃপা আছে, এমন বোধ হয়। তাঁহার বিপুল বংশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিদ্যানুরাগী। এ দেশের উন্নতিকর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কার্য্যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি কোন না কোন প্রকারে যোগ দিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে কৃতী, তাঁহারা বিপুল যশের ভাগী হইয়াছেন। এই যশের ভাগ-বিচারে অনেক ব্যক্তি নানা প্রকার দাবী করেন; কিন্তু ইহার পরিবেশনে যাঁহার প্রাপ্তব্য ভাগ

অধিক, এমন কোন কোন ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ এই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান। দেবেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে অপরকে অগ্রণী করিয়া চলেন। এ জন্য তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাষাবিষয়িণী খ্যাতি প্রধানতঃ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি দেবেন্দ্রনাথের সামান্য একখানি পত্রের ভাষা ভালরূপে আলোচনা করেন, তিনি তাঁহার সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় তাঁহার হৃদয়ের সরস, মধুর ও উদার ভাব সহজে প্রতিফলিত দেখিতে পান। তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় তাঁহার ভাষার উল্লিখিত গুণ বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের লিখিত ভাষা অবলম্বন করেন; যিনি কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন অক্ষয়কুমারের লিখন প্রণালীর অনুসরণ করেন; তেমনি যিনি এক্ষণে ধর্ম্ম-বিচার, ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন বা পদ্মাপারে অবস্থান করুন, তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে এই পত্রিকা ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া অদ্যাবধি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। ইহা মাসিক পত্রিকার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। এই ১৮২৩ শকে ইহার বয়ঃক্রম ৫৯ বৎসর চলিতেছে।

যাহারা বর্ত্তমানকালের সভ্যতাস্রোতে নানা দোষ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বঙ্গভাষার উন্নতি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। এই পত্রিকা তাহার মূল। প্রথম প্রথম যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি উদাসীন ছিলেন, এই পত্রিকা প্রকাশ হইলে ইহার ভাষার পারিপাট্য এবং আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব ও উপকারিতা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই এই সভাদ্বারে আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সরলতা, অটল ব্রতশীলতা, বিশুদ্ধ দেশহিতৈষিতা এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার দলস্থ সমুদয় লোকের উপর সংক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে ইহার লেখকেরা সকলে প্রায় এক ভাবে কথা কহিতেন। এবং কর্ত্তব্যানুরোধে যদি কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন, সমীচীন বিচারগুণে তাহাও হিতকর বলিয়া পরিগৃহীত হইত।

এইরূপ পটুতার সহিত পরিচালিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথমাবস্থায় খৃষ্টান মিশনরিগণের আক্রমণ নিবারণ করেন ; বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত করেন ; শিক্ষাসমাজসংক্রান্ত কর্ম্মচারী-দিগের দোষখণ্ডন দ্বারা দেশে সুশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করেন ; প্রজাপীড়নকারী জমিদারদিগের এবং কৃষক-মোষণকারী নীলকরদিগের হস্ত হইতে দুর্ব্বল দরিদ্র লোকদিগের পরিত্রাণ সাধনের চেষ্টা করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চির দিন বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দেশীয় পবিত্র ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন। প্রথমাবস্থাতেই উপনিষৎ, ঋগ্বেদ, মহাভারত, পুরাণ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুবাদ এই পত্রিকার অঙ্গকে সুশোভিত করিয়াছে। শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক কিরূপে সত্যামৃত লাভ করা যায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহার শিক্ষা-গুরু। ১৭৬৯। ৭২ শকের পত্রিকায় "পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা" "মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব" "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিবরণ" "ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুদিগের বসতি বিস্তার," উপাসক মণ্ডলীর বিবরণ—এবং তত্তুল্য নানা প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে তাহার লেখকের সহিত চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রন্থসভা—পুস্তকালয়।

১৭৬৯ শকে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনতায় এক গ্রন্থসভা স্থাপিত করেন। এই সভায় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর অনুরূপ কার্য্য হইত। পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছিল। অতঃপর উক্ত সোসাইটীর প্রকাশিত বৃহৎ পুস্তকাদি সহ হস্ত লিখিত ও মুদ্রিত শাস্ত্র গ্রন্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। এক্ষণে ঐ ব্রাহ্ম সমাজ-লাইব্রেরি প্রাচীন পুস্তকাবলীর আলয় রূপে পরিগণিত হইতে পারে।

মিশনরি আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ।

এক্ষণে সাধারণের প্রত্যয় এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে। কথাটী সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের কত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া না দেখিলে বুঝা যাইবে না।

খৃষ্টীয় মিশনরিগণের মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী সেইরূপ ডাক্তার ডফ্।

রামমোহন রায় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাইবেল শাস্ত্র একেশ্বর প্রতিপাদন করেন। ইহাতে উত্তম

নীতি-উপদেশ আছে, এই হেতু তিনি উহার প্রচার বাসনা করিতেন। কিন্তু মিশনরিগণ অযথারূপে অথবা অভদ্র বাক্যে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিবে, ইহা তাঁহার প্রাণে বড়ই ক্লেশকর বোধ হইত। এজন্য তিনি নানা প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তদ্বিপরীতে তিনি বাইবেলের আরোপিত ত্রীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক করিতেন, মিশনরিগণ তাহার খণ্ডন দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই প্রকরণের কার্য্য দেবেন্দ্রনাথের সময়েও আবশ্যক হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পাদরী ডফ্ সাহেব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামমোহনের চেষ্টাতেই ডফের আগমন বলা যায়।* এক

* এ দেশীয় খৃষ্টান মিশনরিদিগের গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, স্বাধীনচেতা স্কচ্ মিশনরিগণ বিচারনিষ্ঠ হইতে পারেন। অতএব তিনি তাঁহাদের সভা হইতে সুবুদ্ধি মিশনরিদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

Extract from the Report of Dr. Bryce, Church of Scotland Chaplain in Calcutta.

"Encouraged by the approbation of Rammohun I presented to the General Assembly of 1824 the petition and memorial which first directed the attention of the Church of Scotland to British India as a field for missionary exertions, on the plan that is now so successfully following out, and to which this eminently gifted scholar, himself a Brahmin of high caste, had specially annexed his sanction."

ঈশ্বর প্রতিপাদক বাইবেলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকাতে তিনি উহার অধ্যাপনার্থ ডফ্ সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। * তাঁহার আশা ছিল, বিদ্বান্ ডফ্ অত্রত্য কলেজের নিরীশ্বর শিক্ষাজনিত বিষময় ফলের প্রতিকার করিতে পারিবেন। ফলেও তাহা হইয়াছিল। তাঁহার সুশিক্ষা প্রভাবে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য অত্রত্য যুবক মণ্ডলীর আস্তিক্য বুদ্ধি প্রবল হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গে খৃষ্টানী বিদ্বেষ বিষও সঞ্চারিত হইল। ভারতের সুপুত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী যুবা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মিশনরীগণের কটূক্তি পুনরায় শ্রুত হইল।

---

* ডফ সাহেবের স্কুল (এক্ষণকার General Assembly's Institution) স্থাপনের বৃত্তান্ত এই।

On the young missionary saying that he was at a loss where or how to get a school-house in the native city, Rammohun offered the small hall in Chitpore Road, which the Brahmo Sabha was on the point of leaving for the new building; and driving off at once to the spot secured it for Duff at a rental of £ 4 a month, one pound less than he himself had been paying. He removed other difficulties from Duff's path. By personal influence among his enlightened Hindu friends, he secured their children for Duff's first pupils. On the day of opening,—the 13th of July, 1830—Rammohun Roy was present from the first to explain away prejudices.—S. D. Collet.

ডফ্ সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর এদেশের মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দুইবার ইউরোপে ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মিশন কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।* ঐ সকল দেশে হিন্দুধর্ম্মকে কেবল কলঙ্কময় বলিয়া বর্ণনা করিলে দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা সেই কুৎসিত জঘন্য দৃশ্যকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিস্তর অর্থ দান করেন। অতএব পূর্ব্বাপর প্রায় সকল মিশনরীরা অর্থাগমের ঐ সুগম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সদ্বিদ্যাশালী ডফ্ সাহেবও তাহাই করিয়াছিলেন।

১৮৩৪ অব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া India and India's Missions † প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ আক্রমণ করাতে তত্ত্ববোধিনী সভা তৎপ্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬৭ শকে এই সভা হইতে Vedantic Doctrines Vindicated এবং Rational Analysis of the Gospel নামক পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তকের তাৎপর্য্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের সমর্থন। দ্বিতীয় পুস্তকের তাৎপর্য্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের

* খৃষ্টাব্দ ১৮৩৪ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর এবং ১৮৫০ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর।

† ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।

বিচার। ডফ্ সাহেব নানা গুণে এ দেশের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার ন্যায় ভারতের হিতৈষী লোকও কার্য্যতঃ আমাদের কুৎসা গানে ও অপ্রিয়-সাধনে প্রবৃত্ত, ইহার প্রমাণ দর্শন করিয়া এদেশের মিশনরী গুণ-পক্ষপাতী লোকেরাও চটিয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা উপরোক্ত পুস্তকদ্বয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অযৌক্তিকতা এবং বেদান্তধর্ম্মের সারবত্তা বিলক্ষণ রূপে বুঝিলেন। আলোচনার উপর আলোচনায় মিশনরী-দিগের ভ্রান্তি ও দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলে সকলেরই মন উত্তেজিত হইল। এই মহা আন্দোলনে নিদ্রিতপ্রায় হিন্দু-সমাজ জাগিয়া উঠিলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারবেগ মন্দীভূত হইল।

রামমোহন রায়ের অনুকরণে খৃষ্টীয় শাস্ত্রকে ছাঁকিয়া যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম হইল—The Rational analysis of the Gospel; কিন্তু তাহাতে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ডফ্ সাহেব তাহার নাম দিলেন, The irrational paralysis of the Gospel. উত্তরোত্তর ব্রাহ্মসমাজের যেমন উন্নতি ও বিস্তার হইতে চলিল, ডফ্ সাহেবের মর্ম্মান্তিক বেদনা তেমনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৬৩ অব্দে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ডফ্ সাহেব এ দেশীয়দিগের উদ্দেশে নিরাশ অন্তঃকরণে বলিয়া গেলেন :—

I cannot, I cannot, in bidding you adieu now, bear the thought of bidding you adieu for ever !— in separating from you now in time, bear the thought of separating from you for all eternity !— in rejoicing over your earthly welfare and prosperity, bear the thought of having to mourn over your forfeiture of the heavenly inheritance.

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়।

সদ্বিদ্যাশালী ডাক্তার আলেক্‌জণ্ডর ডফ্‌ ডি, ডি, এল্‌ এল্‌ ডি, এদেশের সর্ব্বার্থ অবগত হইয়া এই আক্ষেপ করিতেন যে, এদেশীয় অখৃষ্টান সমস্ত লোকের সহিত তাঁহার অনন্ত কালের পার্থক্য সন্নিকট ; অর্থাৎ অনন্তকালের জন্য তিনি স্বর্গে এবং এদেশীয় কোটি কোটি অখৃষ্টান লোক নরকে প্রস্থিত হইবে। যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের এইরূপ পরিণতি, তাঁহারা এদেশের শিক্ষা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, এবং স্কুল ও কলেজে যেমন শিক্ষা দিবেন, ছাত্রদিগের বুদ্ধি বিদ্যা ও চরিত্র সেইরূপে গঠিত হইবে,—এ ব্যবস্থা কি সামান্য বিড়ম্বনা ? ইহার অধিক আমাদের দুর্ভাগ্য-লক্ষণ আর আছে কি না, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যে দেশে রামমোহন রায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশে শিক্ষাসংক্রান্ত এই দুর্গতি পরিজ্ঞাত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ধর্ম্মবিচারে রামমোহনের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সুশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাঁহার সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন। আর ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের সন্তানদিগের সুশিক্ষাবিধান আমাদেরই কর্ত্তব্য। অতএব বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারাই হিন্দুকলেজাদি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইংরাজদিগের হস্তে সমুদয় ভারতের মৃত্তিকা যদি ইংলণ্ডের হইল, বিদ্যালয় গুলি আর এদেশীয়দিগের অধিকারভুক্ত কেন থাকিবে? * ক্রমে ক্রমে স্কুলকলেজগুলি গবর্ণমেণ্টের স্বকীয় সম্পত্তিরূপে পরিগৃহীত হইল। ইংরাজী ভাষার সহিত এতদ্দেশীয় ভাষা সকলেরও ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল; ক্রমে ক্রমে ইংরাজির পরাক্রমই জয়যুক্ত হইল।

* হিন্দু কলেজ প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে এ দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো না কাহারো বাটীতে উহার কার্য্য হইত। ১৮২৫ অব্দে বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের এই বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইলে অংশাংশীরূপে হিন্দুকলেজ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। হিন্দুকলেজের নিমিত্ত এ দেশীয় লোকেরা কেহ পঞ্চাশ হাজার কেহ বা কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। প্রথমেই লক্ষ

শিক্ষাসংক্রান্ত এই বিড়ম্বনা পরিহার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল চেষ্টা করেন, দেবেন্দ্র নাথের চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান।

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ডফ্ সাহেব প্রভৃতি মিশনরিগণ বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারাই এদেশীয় লোকের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিতেছেন। অতএব তাঁহার প্রতীতি হইল যে, আমাদের পক্ষেও উক্ত মিশনরিদিগের কলেজাদির ন্যায় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এজন্য দেবেন্দ্রনাথ অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে ফিরিলেন। সিমুলিয়াতে এক সভা হইল। এই সভায় কলিকাতাস্থ ধনী নির্দ্ধন, মধ্যবৃত্ত প্রায় সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইল। সকলে একত্রিত হইয়া "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ধিক টাকা জমা হইয়াছিল। পরে আয়ের অল্পতা এবং ব্যয়ের বাহুল্য হইলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল। ১৮৪৪ অব্দে কলেজটী সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন হইল। প্রথমে বর্দ্ধমানের মহারাজা এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর হিন্দু কলেজের দুই "গবর্ণর" ছিলেন। শেষে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এক গবর্ণর হয়েন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ডেলহৌসি হিন্দু কলেজের সর্ব্বতোভাবে নূতন গঠন করিতে উদ্যত হইলে প্রসন্নকুমার নাম মাত্র "গবর্ণর" পদ রাখিতে ইচ্ছু হইলেন না।

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিদিগের তালিকায় এই সকল নাম পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, (ছাতুবাবু নামে প্রসিদ্ধ) প্রমথনাথ দেব, (লাটু বাবু নামে প্রসিদ্ধ) ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরতন হাল্‌দার, বীর নৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ও রাজকৃষ্ণ মিত্র - অধ্যক্ষ। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন-সম্পাদক। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব—ধনাধ্যক্ষ।

এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সকল ক্ষেত্রেই এদেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর একরূপ পরিচয় পাওয়াযায়। Joseph Barretto and sons, এই নামধেয় কুঠি দেউলিয়া হইলে যেমন হিন্দুকলেজের মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আশুতোষ বাবু ও প্রমথনাথ বাবু দেউলিয়া হওয়াতে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়েরও মূলধন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং উহার অন্তর্দ্ধান হইল।

শুনা যায়, প্রথমেই হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা মূলধন উত্থিত হইয়াছিল এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

যে সকল ধনী কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম ইহার সহিত সংযুক্ত দেখা গেল, তাহাতে প্রত্যয় হয়, এই বিদ্যালয় দীর্ঘজীবী হইলে ইহা হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট শক্তির কেন্দ্রস্থল হইত।

পিতৃবিয়োগ।

যে বৎসর হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান হয়, সেই বৎসর (১৮৪৫) দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করেন। প্রথম যাত্রায় (১৮৪২) রোমের পোপ, প্রুসিয়ার প্রিন্স, ফ্রান্সের ও বেলজীয়মের রাজা-রাণী ও ইংলণ্ডের মহারাণী সপরিবারে তাঁহার মহা সমাদর করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যাত্রায় তাঁহার জীবন কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১ আগষ্ট দিবসে ৫১বৎসর বয়সে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ যখন এদেশে উপস্থিত হইল, তখন ভ্রমণপ্রিয় দেবেন্দ্রনাথ নদীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার অনন্ত বিষয় কর্ম্মের ভার হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধে অধ্যারোপিত হইল।

কিরূপে দেবেন্দ্রনাথ সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিলেন;—কিরূপে তিনি একান্ত নির্লোভ অন্তঃকরণে পিতার ঋণ রাশি স্বীকার করিয়া দরিদ্র বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে সেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইলেন, এবং কিরূপে মিতব্যয়িতা সহকারে যথাসম্ভব ধন সঞ্চয় করিয়া মহাসম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীবর্গের সহিত সমপদবীতে কালহরণ করিতে লাগিলেন,—দেবেন্দ্র নাথের সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে আর কিছু না ধরিলেও এই বিষয়ের ইতিবৃত্তিটুকু মহামূল্য এবং মহোচ্চ শিক্ষাপ্রদ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি।

রামমোহন রায় বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সর্ব্ববস্তুগত অগ্নির ন্যায় এক প্রকার অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার কিরূপে ধ্যান ধারণা করিতে হয়, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী দ্বারা তাহাই জানা যায়। কিন্তু কি প্রকারে এই সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম সাধন করা যায়, অথবা কিরূপে ইহাকে সর্ব্বার্থসাধক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, রামমোহন রায় তাহার কোন পদ্ধতি স্থির করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই কর্ম্মের ভার দেবেন্দ্র নাথের উপর ন্যস্ত ছিল, বলিতে হইবে।

এতদ্‌বিষয়ে দেবেন্দ্র নাথের কর্ম্মগুলি নিম্নোক্ত রূপে গণনা করা যায় :—

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিরূপণ।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সঙ্গত উপাসনা-পদ্ধতি।

৪। ব্রহ্মসঙ্গীতের বিস্তার।

৫। নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস নির্ণয়।

৯। ব্রহ্মোপাসনা-সহযোগী ধর্ম্মের ব্যাখ্যান;

১০। অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

এতদ্ভিন্ন মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র, ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব সহ মানব হৃদয়ের নানাধর্ম্ম লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা দেবেন্দ্র নাথের জীবনের বর্ত্তমান যুগোপযোগী অসাধারণ কর্ম্ম।

এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি পরিস্ফুট হইত না। কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকের গ্রহণীয় হয়, এই চিন্তা প্রথমাবধি দেবেন্দ্র নাথের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। ক্রমশঃ তাহার উপযোগী উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ও পদ্ধতি কালে কালে রচিত ও পুষ্টি প্রাপ্ত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

দেবেন্দ্রনাথের উপরিউক্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী কার্য্য বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। উপনিষৎ আলোচনা দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক ও তাঁহার পক্ষে সর্ব্বরসাত্মক। তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক বিমল জ্ঞানে আপনি তৃপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত লোককে সেই জ্ঞানামৃত রস দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলন করিলেন। "শ্রুতে রর্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ"—শ্রুতির অনুগত হইয়া স্মৃতি সকল প্রকাশিত হইল। দুই খণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পূর্ণাকার ধারণ করিল। শাস্ত্রীয় মহামন্ত্র সকল নখদর্পণে প্রত্যানীত হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি এই চেষ্টা যে, শাস্ত্রবাক্য সকল পরম যত্নে বুঝিয়া তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মহামন্ত্রের বাঙ্গালা ভাষায় অর্থ প্রকাশ করা হইল। নিগূঢ়ার্থ শ্রুতিবচনের সংক্ষেপ অর্থে লোকের তৃপ্তি হয় না, অতএব পরে ঐ অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইল। ১৭৭১ শক হইতে প্রায় ৫ বৎসরে এই কার্য্য সমাধা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার চেষ্টা করিতেন। শ্রুতি সকলের চিরাগত উচ্চারণ শিখাইবার নিমিত্তই বা তাঁহার কত যত্ন। ইহাতে শত শত লোকের কর্ণ তৃপ্ত হইল। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্ম-সংযম শিক্ষার এবং স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার

উপয়োগী এতাবৎ উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকদিগের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ হইতে লাগিল। নির্দ্বন্দ্ব চিরক্রমাগত বিশ্বমান্য সুনিশ্চিতার্থ এবং পরম কল্যাণ সাধক শাস্ত্র বাক্যসকল সমুদিত হইলে বঙ্গ-দেশে ধর্ম্মশিক্ষার এক নূতন প্রবাহ চলিতে লাগিল। বঙ্গবাসীগণ শাস্ত্রদৃষ্টি বিষয়ে চক্ষুষ্মান হইলেন।

এই গ্রন্থ নানা আকার ও প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত হয়। দুই খণ্ডের বাঙ্গালা অর্থ ও তাৎপর্য্য সমেত লাল কাল অক্ষরে সুদৃশ্য গ্রন্থ ১৭৯১ শকে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭১ শকে আরম্ভ হইয়া ১৭৯১ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে এই গ্রন্থ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগ।

যাহা বুঝা গেল, তাহার আচরণ করিতে হইবে; এই দিকে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার সংযোগ সাধন হইলে পর ব্রাহ্ম সমাজ লোকে পরিপূর্ণ হইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নানা প্রকার লোকের সমাগম হয়, কিন্তু কে কি জন্য আসেন, তাহার কোনই পরিচয় নাই; ব্রাহ্ম সমাজে কি ভাবে কি করিতে হয়, তাহার কোন পদ্ধতি নাই। এ অবস্থায় দেবেন্দ্র নাথের সন্তোষ জন্মিল না।

তিনি চাহেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত এই ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া লোকেরা পরস্পর এক মত এবং এক ভাব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়টী তত্ত্ববোধিনী সভায় আলোচিত হইয়া স্থির হইল, যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজসন্নিবিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।

এই প্রকারে কতকগুলি লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু যে ধর্ম্ম তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোন্ বিশেষ লক্ষণ প্রখ্যাত নাই। এই অভাব অনুভূত হইলে তাহার পূরণ হইতে লাগিল। পরিমিত কথায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণ নির্ণীত হইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব সেই বীজ রূপ লক্ষণাবলী মধ্যে নিহিত। তাহা হইতে শাখাপল্লব স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, তাহার তাৎপর্য্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইল।

অতঃপর ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক। ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকিতেন যে, তাঁহারা অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন না। ক্রমশঃ স্থির হইল, তাঁহারা দেবদেবীর পূজা বা হোমাদি ক্রিয়া করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা প্রথমতঃ পরিস্ফুট ও সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই। পরে এমন এক সময় উপস্থিত হইল যখন উক্ত প্রকার পৌত্তলিক পূজা ত্যাগ করা ব্রাহ্ম-

দিগের অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞান হইল। নবোৎসাহসম্পন্ন যুবকেরা তাঁহাদের উক্ত প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করিতে পদ্ধপরিকর হইলেন। তদুপযোগী অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্ম ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতিতে ঋষিদিগের শুভ শোভন মন্ত্র গুলি সমস্ত রক্ষা করিলেন। তিনি নিজেই তাঁহার অনুষ্ঠান পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠাতা হইয়া নিজ পরিবারে নিত্যযুক্ত-জ্ঞানকর্ম্ম সমন্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরিবারেও উক্ত পদ্ধতি মতে ক্রিয়ানুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্ম দল বৃদ্ধি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আছে, কিন্তু মুখে নাই; অথবা মুখে আছে কিন্তু কার্য্যে নাই—ইহা বড়ই কুলক্ষণ। যিনি ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহার সর্ব্বাংশে ব্রাহ্ম লক্ষণ প্রকাশ পাইবে—নতুবা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কেবল বিড়ম্বনা। দেবেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপদ্ধতি রচনার ফল ফলিয়াছে, ব্রাহ্মেরা পরিমিত দেবতার স্থানে অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করিয়া সকল গার্হস্থ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন তাঁহার পরমানন্দ অনুভূত হইল।

কিন্তু এখনো তাঁহার আর একটী কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখা গেল।

যাঁহারা ব্রাহ্ম পদ্ধতি মতে গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া "অনুষ্ঠানকারী" নাম প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা এমন ইচ্ছা করিলেন যে "ব্রাহ্ম"শব্দে কেবল তাঁহাদিগকে-বুঝাইবে, অপর লোকেরা ব্রাহ্মসমাজ-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ উপরোক্ত ব্যবস্থায় কোন প্রকারে মত দিলেন না। তাহাতে বিস্তর বাদানুবাদ হইল। কতক-গুলি লোক ভিন্নপ্রণালীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্য তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, মনুষ্য ভিন্নরুচি; কালক্রমে সমাজ পদ্ধতির নানা পরিবর্ত্তন সম্ভব; পূর্ব্ব-ইতিহাসেরও আবার আবর্ত্তন হয়। অতএব তিনি রাম মোহন রায়ের বাক্য অব-লম্বন করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে, সুবুদ্ধির প্ররোচনায় যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ব্রাহ্মেরা কার্য্য করিতে চাহেন, তাহা করিতে পারেন, কেবল এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যে, ধর্ম্মমতের প্রভেদ জন্য যেন বিবাদ কলহ না হয়; যেহেতু বস্তুত সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক।

এই উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন; অথচ ধর্ম্মভেদবুদ্ধি না থাকাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি হইতে পারিল না।

ব্রত প্রতিষ্ঠা ।

ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রী শূদ্রাদি সকল লোকের অধিকার দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ব্রত। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ছায়া স্বরূপিণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার প্রথম পৃষ্ঠাবধি এই ব্রতের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন দেখাযায়। তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করিয়া এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি শরীর মন ধন সকলি দিয়াছেন; নানা প্রকার লোকের নিকট নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; ধর্ম্মসংস্কারের পক্ষে সচরাচর যে সকল দুর্গতি ঘটে, তাঁহার তাহা ভোগ হইয়াছে।

শ্রীমৎ চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার পক্ষে যেমন—

পাত্রাপাত্র বিচারণাং ন কুরুতে
ন স্বং পরং বীক্ষতে।

পাত্রপাত্র বিচার না করিয়া সকলকেই হরিনামরূপ মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথও সেই-রূপ স্ত্রী শূদ্র পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সময় যেমন বঙ্গদেশে হরিনাম ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সমগ্র ভারতভূমিতে সেইরূপ ব্রহ্ম নাম প্রতিধ্বনি হইয়াছে। প্রকৃতার্থে হরিনাম গ্রহণের ন্যায় এই ব্রহ্মমন্ত্রের সমুচিত সাধনা করিতে লোক পারুক বা না পারুক, ইহা কি প্রকারে অবলম্বন করিতে হয়,—কি প্রকারে সমস্ত

পরিবার মিলিয়া ব্রহ্মপূজা করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার পদ্ধতি প্রদর্শন করিলেন এবং আপনি তাহার উদাহরণ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিলেন।

এ বিষয়ে অনেকেই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিলেন; যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহারাও কোন কোন অংশে তাঁহার ব্রতভঙ্গের উপক্রম করিলেন, কিন্তু সুবুদ্ধি একনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ কেবল ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলেন। জ্ঞানকর্ম্মসমন্বিত পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ে বদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের আশ্রয়স্থান ও সেবনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিয়ত "যোগযুক্তাত্মা।" "মহর্ষি" শব্দে যেমন তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় হয়, এমন আর কোন শব্দে হয় না। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণকে কি রূপে চিনিতে হয়; কি প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্ম বুঝা যায়, তাহারই বর্ণনা ও বিচারে তাঁহার ষষ্টিবর্ষীয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিপূর্ণ। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান অধ্যয়ন করিলে প্রকৃত ঋষিতর্পণ হয়।

ব্রাহ্মসমাজ আদ্যোপান্ত যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন, তাহা হিন্দুদিগের চিরন্তন সার

সম্পত্তি। সম্প্রতি তাঁহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে গৃহস্থ অবস্থায় সে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই সংস্কারের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন।

রামমোহন রায় শাস্ত্র প্রমাণে বুঝাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইতেন। এই শব্দ প্রমাণ মাত্র দ্বারা সকল লোকের প্রত্যয় দৃঢ় হয় নাই। তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুদিগের যথোচিত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে নাই। গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী অসম্ভব কথা, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই ধারণার বৈয়র্থ্য সাধন জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব বলিতে হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যোগ সাধনতৎপর। বেদবিদ্যা তাঁহার সুসাধিত। স্মরণ মাত্রেই উপনিষদ্ ও শাস্ত্রীয় বচনাবলী তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়। তদ্ভিন্ন কোন লৌকিকী বিদ্যাও তাঁহার অগোচর নহে। যিনি তাঁহার নিকট যে কামনায় উপস্থিত হয়েন, সেই কামনার যথা-সম্ভব ফললাভ হইতে পারে। তাহাতে জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় হয়। কোন অলৌকিকতা তাহাতে নাই।

তীর্থ বাস।

ব্রহ্মপরায়ণ এই গৃহস্থ ঋষির গৃহবাসের কাল অপেক্ষা তীর্থবাসের কালই অধিক। সে তীর্থ যেমন সাধারণ, তেমনি অসাধারণ।

"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।"
ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে এবং জলের প্রখর স্রোতে যে 'তীর্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, এই ঋষি তাহারই অনুরাগী। তাঁহার তীর্থ হিমাচল শিখর, সাগরবক্ষ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ এবং রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বৃক্ষপল্লবশূন্য মানব-সম্পর্ক-বর্জ্জিত যোজনবিস্তৃত এবং মহা প্রান্তর।

জীবনের অধিকাংশকাল তিনি এই সকল শান্তি-রসাস্পদ স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন পর-ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিয়াছেন। অথচ তাঁহার লক্ষ লক্ষ প্রজা, সহস্র সহস্র প্রতিপাল্য ব্যক্তি, শতাধিক পরিজন এবং এই দুঃখ-দারিদ্র-পূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারত-ভূমি,—কেহই তাঁহার নিকট তাহার প্রাপ্য বস্তু লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

"পরিগ্রহাম্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা।"

অতএব তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সাধনক্ষেত্র বোলপুরস্থ "শান্তি-নিকেতন" তীর্থতুল্য পরিগণিত হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

উপসংহার।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মুখ্য কর্ম্ম। তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ আলোচনা দ্বারা এই প্রস্তাবের উপসংহার করা বিহিত।

যাগযজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল কি প্রতিকূল, এই বিষয়ে ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া বিচার হইতেছে। গীতাগ্রন্থ জ্ঞান ও কর্ম্ম, দুই পক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহাতে সকলের তৃপ্তি হইল না। অতএব তান্ত্রিকেরা মন্বাদি স্মৃতির সার সংগ্রহ পূর্ব্বক মন্ত্রময় যজ্ঞের বিধান করিলেন। পরে নানাসম্প্রদায়ে ভগবৎসেবী বৈষ্ণবগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ও যোগতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া ভক্তিমার্গগামী হইলেন। এইরূপে দেখাযায় যে, অল্পকাল পূর্ব্বেও ভারতে কর্ম্মের অবসাদে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু পরে তদুভয়েরই অবসাদ হইল। সাধারণতঃ ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম গীতোক্ত ব্যামিশ্রলক্ষণাক্রান্ত ও মোহজনক হইয়া পড়িল। তাহাতে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদর্শন ক্রমশঃ খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়া এক একটী মনুষ্যের পূজা ও জড়-সেবার প্রসার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ব্রহ্মবর্চ্চসের অভাবে সকল দুর্গতি সম্ভব হইল।

এমন অবস্থায় রাজর্ষি রামমোহন রায় জনকাদি-প্রাচীন-ঋষি-সেবিত অনাবিল ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় করেন। তৎপ্রকাশিত উপনিষদাদি গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রচার ও আলোচনার নিমিত্ত আর এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় আবশ্যক হইয়াছিল। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

এই মহাত্মার বিমল হৃদয়ে "নেদং যদিদমুপাসতে" এই উপনিষদ্বাক্য প্রথম বয়েসেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে

এমন জাগরণ হেতু তাহাতে আর তন্দ্রা ঘটিল না; ব্রহ্ম-জ্ঞানের তত্ত্ব আর প্রচ্ছন্ন রহিল না। তখন, "যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ" এই গীতাবচন সংলগ্ন হইল। তৎকালীন শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের অন্তরের ব্যাকুলতা এইরূপে উদ্গীত হইয়াছিল :—

"কি হবে, কি হবে, দিবা আলোকে;
জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।"

তাহার পরে ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানামৃত অহরহ পান করিয়া তিনি "সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ" এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিলেন। তাহার ফল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ। যখন অলক্ষিত-পরিসর সাগরোপসাগর সকলের ন্যায় শাস্ত্রসকল প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন কি প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রমে শাস্ত্র গ্রন্থ রাশির সংগ্রহ হইয়াছিল এবং তাহা মন্থন পূর্ব্বক এই অমৃত উদ্ধার করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দ্বারা ব্রহ্মবাদীদিগের ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে উদ্বোধিত হইলে তাহা পরম উপাদেয় বোধে সকলে গ্রহণ করিলেন। তাহার ব্যাখ্যা ও প্রচারাদি কার্য্যে উক্ত মহাত্মাকে আরো যে পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী যথার্থতঃ অশেষ। তত্তাবৎ দ্বারা তাঁহার জীবনকালব্যাপী তপস্যা বিদিত হয়।

"গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ"—এই প্রচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যুবা দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের গৃহবাসের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তদবধি এই অতিবৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার একই নিষ্ঠা। এক্ষণে তিনি আপন বৃদ্ধ পুত্রের সহিত সেই শ্লোকের সম্পূর্ত্তি অর্থাৎ "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং" সপ্রমাণ করিতেছেন।

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

এই মনু বাক্য যেমন শ্রীমন্মহর্ষির নিজের জীবনে, তেমনি তাঁহার ক্ষণজন্মা পুত্রের জীবনে সার্থক দেখাযায়। পরমপবিত্রচরিত্র মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কৃত অহোরাত্র ধর্ম্মব্যাখ্যানে সমস্ত জনগণের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়াছেন যে "উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং—প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং—এবং নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশ পাইতেছেন।" তাঁহার অনুরূপ পুত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববিদ্যার শুদ্ধ বুদ্ধিতে পিতৃপ্রচারিত ধর্ম্মের অচল প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া দিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও তাহার উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন। অর্থগৌরবনিমিত্ত তাহারই কিয়দংশ উদ্ধার

পূর্ব্বক শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহৎ জীবনের এই স্বল্প পরিচয় সমাপ্ত করা যাইতেছে।

"পূজ্যপাদ পিতৃদেব আর কোনো জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে না ঝুঁকিয়া নিছক কেবল উপনিষদাদি হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মন্থন করিয়াছেন—ইহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি-দিগের কত যে মঙ্গল সাধন করা হইয়াছে তাহা যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পা'ন। উপনিষদের বেদবাণী একপ্রকার অন্তঃশীলা সরস্বতী নদী; তাহা ঐতিহাসিক আর্য্যজাতির অস্থিমজ্জার ভিতরে চিরকালই প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং এখনো কার্য্য করিতেছে। তাহা যখন কাল-সোপানে আর দুই এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আর্য্যজাতির বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানকে বিবাহডোরে বন্ধন করিবে, এবং তাহার আর কিছুকাল পরে সর্ব্বাঙ্গীন সত্যের ফল ফলাইয়া তুলিবে; তখন আর্য্যজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্রের সারভূত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা জগতের চক্ষে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইবে।

"উপনিষদাদিতে যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান দুয়েরই মর্ম্মনিহিত নিগূঢ়তম কথা; ইহুদী এবং আরব দেশীয় একেশ্বরবাদ অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের কথা। সর্ব্বভূতে পরমাত্মার সত্তা-উপলব্ধি যেরূপ উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান, সেরূপ জ্ঞানের কার্য্যই তো এই যে, তাহা আর আর সমস্ত শাখাজ্ঞানকে

আত্মসাৎ করিয়া, এবং তাহাদের সমস্ত বিরোধের সমন্বয় করিয়া, সকল সত্যকে এক সত্যে পরিণত করিবে। যে জ্ঞান আপনি ব্যাপক গভীর এবং শক্তিশালী; সে জ্ঞান অপরের দোষ পরিমার্জ্জন এবং গুণ পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহাকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইবে—ইহাই পরমেশ্বরের নিয়ম।

"কাজেই তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সে মঙ্গল সামান্য মঙ্গল নহে;—তাহার গুণে যখন সমস্ত উচ্চ নীচ সম-শ্রেণীর মধ্যে, সুর বাঁধিয়া গিয়া সমস্তের মধ্য হইতে তান-মান-লয়-সঙ্গত মহান্ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাহির হইতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য-কলাপের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হয়।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শান্তিনিকেতন।

ভূমিকা।

এই পুণ্যক্ষেত্র শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "শান্তিনিকেতন" নামক সাধনাশ্রম। ইহার প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিবরণ অনুস্যূত। এই প্রবন্ধে উক্ত যুগলমঙ্গলের কতক পরিচয় দিবার চেষ্টা হইতেছে।

মহামতি শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের পর স্বকীয় মনীষা ও তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গে পরিপুষ্ট করিয়া দেশময় প্রচারিত করিয়াছেন। যে যে দিন এক এক নূতন উৎসের যোগ প্রাপ্ত হইয়া এই মঙ্গলপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার এক দিন ৭ পৌষ। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ দিবসে ব্রতরূপে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। তদবধি ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গলভাব বিস্তারিত হইতেছে। সেই শুভ দিনের স্মরণ উদ্দেশে ১৮১৩ শকের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনের এই সুশোভন মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করা হইয়াছে।

আমরা এই পুণ্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের অতুলিত পবিত্র জীবনের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছি।

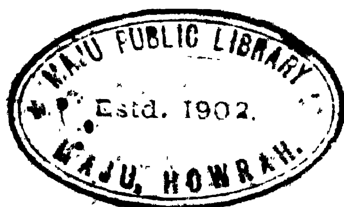
শান্তিনিকেতনের পরিচয়।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর বিভাগের মধ্যে একখণ্ড (ডাঙ্গা) ভূমি এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ঈশ্বর চিন্তার নির্জ্জন স্থান; প্রথমে বৃক্ষাদি শূন্য ছিল; এক্ষণে তরুশোভিত ও আশ্রমলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

১৭৮৪ শকের (১২৬৯ সালের) ১৮ ফাল্গুন এই স্থানের মৌরসী পাট্টা গৃহীত হয়। ১৮০৯ শকের (১২৯৪ সালের) ২৬ ফাল্গুন ইহা ট্রষ্টীদিগের হস্তে কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত অর্পিত হয়। ১৮১০ শকের ৪ কার্ত্তিক এই স্থানে আশ্রম ব্যবস্থাপিত হয়। ১৮১২ শকের ২২ অগ্রহায়ণ ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়। ১৮১৩ শকের ৭ পৌষ মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৪ শকের ৭ পৌষ প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

ভিত্তিমূলে প্রোথিত তাম্রফলকে এই কয়েকটী কথা (দেবনাগর অক্ষরে) খোদিত আছে:—

"ওঁ তৎ সৎ। ঠাকুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথশর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যাব্দ, অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।"



শান্তিনিকেতন।

অতি অল্প বয়সে শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞাননেত্রে অনন্ত আকাশের অধিষ্ঠাতা অনন্তদেব দেখা দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত মহাপুরুষের স্বাভাবিক অধিকার। পড়িয়া শিখিয়া এবং অতি কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করিতে হয় নাই। তথাপি ইহাও প্রথিত যে, তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের কর্ম্ম ব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ষড়্বিংশ বৎসর, তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিপাদিত ধর্ম্মকে ব্রতরূপে অবলম্বন না করিলে উহার সুপ্রতিষ্ঠা হইবে না। এই তত্ত্ব যখন তাঁহার চিত্তকে সম্যক্ অধিকার করিয়াছে, তখন তাঁহার যে সেই ব্রতাবলম্বন হয় নাই, তাহা কে বলিবে? শ্রীমচ্চৈতন্য দেব একদিন সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাত্মা ঈশা একদিন জলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কে বলিবে যে, তাহা না হইলে উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের ধর্ম্মসাধনের ত্রুটি হইত। শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথও ঐরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিজের সুচিন্তিত ধর্ম্ম-

গ্রহণ-মন্ত্রাবলী নিজেই পাঠ করিয়া উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু একাকী নহে। একবারে কতকগুলি লোকের সহিত একত্র এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। যেমন নিজের আচরণ, তেমনি শিক্ষা দান, দুই কর্ম্ম একত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

এইটী অন্যান্য ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের তুলনায় অসাধারণ। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কেহ উপদেষ্টা, কেহ উপদেশ্য, কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ ভেদ নাই, এতদ্দ্বারা এই বিধান প্রথিত হইল। গুরু ও শিষ্য এক পদবীতে দণ্ডায়মান হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ কেশব ভারতী বা জন দি ব্যাপ্টিষ্টের ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ষড়্‌বিংশ বর্ষীয় দেবেন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার সঙ্গে আরো ১৯ জনকে "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ" করাইয়া এই ব্রতের প্রবর্ত্তক হইলেন। অল্প দিন মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ বহু লোক এই পথের পথিক রূপে দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

কিরূপে এই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত অবলম্বন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট ও এই ব্রত জনসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে ;—কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম যথাকালে শাখা পল্লবে ও পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের তুল্য হইয়া সমুদায় ভারতবর্ষকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহাও স্মরণ করিবার

দিন ৭ই পৌষ। ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ভক্তবৃন্দ এই ৭ই পৌষকে উক্ত সমস্ত বৃত্তান্তের সহিত স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের কৃপায় উৎসবানন্দ অনুভব করুন।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতিদর্শন ও শাস্ত্রপাঠ, এই দুই উপায়ে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। এ দেশের রীতি এই যে, ব্রাহ্মণসন্তানগণ পিতৃগৃহে সাবিত্রীমন্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় তথায় কিছুদিন সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিয়া পাঠের উন্নতি অনুসারে দূরতর দেশে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ও অধ্যাপকের নিকট জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃত অধ্যাপক বাহ্য প্রকৃতি এবং উপনিষদাদি গ্রন্থ। ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্যে আত্মজ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও প্রকৃতি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা বলিতে পারি, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে ব্রহ্মদর্শনের জন্য যে অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টি আর ব্যাবৃত্ত হয় নাই। বাহ্য লক্ষণেই দেখা যাইতেছে যে, তদবধি তিনি মুক্তাকাশদর্শনার্থ সর্ব্বদা গৃহের বাহিরে বাহিরে থাকিতেন, এবং কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই পর্ব্বতে সমুদ্রে ও নদীবক্ষে এবং এইরূপ মহা প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন। যত দিন তাঁহার শরীরে বল ছিল, তত দিন তিনি শরীরকে মুক্তাকাশের মধ্যগত

করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আয়ত চক্ষু সেই আকাশের মধ্যে বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়াছে।

এই প্রকার ভ্রমণশীলতা ও বিদেশ বাসের মধ্যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিবেন, তাঁহারা জানিবেন যে, জন্মাবধি এই শাল-মহীরুহকে অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া আসিতে হইয়াছে। শ্রীমন্মহর্ষি এই ঝঞ্ঝাবাতাবর্ত্তের মধ্যস্থানে থাকিয়া অতি ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, এবং সেই সঙ্গে সৌজন্য ও মহত্ত্ব সহকারে ইহার সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছেন।

প্রথম বয়সে যিনি তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা, পরিণত বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন-প্রয়াসী,—এই দুই কর্ম্মে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের গতি বিদিত হইবে। তন্ত্রের উক্তি এই ছিল, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ।" শাস্ত্র সকলের এই সুমীমাংসিত উপদেশ। কিন্তু এই শাস্ত্র মতে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা গৃহধর্ম্মে সেই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চার পক্ষে নব যুগ। বিজ্ঞানালোকে প্রকৃতিদর্শী দেবেন্দ্রনাথ যথার্থতঃ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনের আদর্শ-স্বরূপ হইলেন। অথচ নির্জ্জনবাস যে তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তা করে, তাহাও

তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইল। তিনি নিত্য-শান্তি-নিকেতনের প্রবল-আশা বক্ষে ধারণ করিয়া দ্বন্দ্বময় সংসারে বাস করিতেছেন, এই 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে।

রাজৈশ্বর্য্যশালী দেবেন্দ্রনাথ সংসারের প্রায় সকল কর্ম্মেই সুনিপুণ। কিন্তু তাঁহার জীবনের তাবৎ ঘটনা ও কার্য্যকলাপ কেবল একটী উদ্দেশ্য সাধনের অভিমুখী। সে উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি। তাঁহার ধন-ঐশ্বর্য্য, তাঁহার মানমর্য্যাদা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সকলেরই মুখ্য ফল অথবা এক ফল সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্মোপাসনার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের এই অসাধারণ গৌরব। এই তাঁহার মহদ্‌যশ। এই মাহাত্ম্যে তাঁহাকে শ্রীমন্মহর্ষি নামে পূজা করা যায়।

এতদ্দ্বারা এই মহাত্মার যে মহৎ যশ ও কীর্ত্তি বিদিত হয়, সেই মহতী প্রতিষ্ঠা তিনি কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও ভক্তির গুণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন তাঁহার কোন শক্তি স্ফুর্ত্তি পায় নাই; কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। তিনি কোন দৈবশক্তির অভিমান রাখেন না। তিনি নিরীহ নিষ্কাম ও ঈশ্বরানুগত। তিনি ভবিষ্যতের ভাল মন্দ কিছুই না ভাবিয়া চলিয়াছেন। রাগ দ্বেষবিহীন বিশুদ্ধহৃদয়ে যাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

এ দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখাযায় যে, এদেশীয় সমস্ত শাস্ত্রই ব্রহ্মবিচারে ও ব্রহ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু সে সমস্ত নিষ্ফলপ্রায়; কারণ, সে ব্রহ্মের কোন প্রকারে আরাধনা বা উপাসনা হয় না। অতএব অকৃত অমৃত নির্ব্বিকার পরমেশ্বর যেমন অবিজ্ঞাত, তেমনি অবজ্ঞাত হইয়া আছেন। এই মহাক্ষোভ ও অভাব নিবারণের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেই পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে; জনসমাজে বা পরিবার মধ্যে আর কোথাও ব্রহ্মোপাসনার কোন প্রকার চিহ্ন নাই। শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মোপাসনাকে মনুষ্যের সমস্ত জীবনের সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং এই ধর্ম্মকে সকলের অবলম্বনীয় করিয়া তুলিবেন, এইজন্য জন্মিয়াছেন। অতএব তিনি প্রথমাবধি ঐ একই দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দ্বারা তিনি সকল ব্রাহ্মের স্মৃতিপটে এই কথা মুদ্রিত করিয়া রাখিলেন যে, পরব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিমাদি প্রাকৃত সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা অকর্ত্তব্য।

তাহার পর, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পরম্পরাগত প্রাচীন উৎকৃষ্ট সারার্থ মন্ত্রাবলি উদ্ধার পূর্ব্বক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইল। অতি অল্পাক্ষরে

ব্রাহ্মধর্ম্মের সার মত সঙ্কলন করা হইল। সেই বীজভূত সার মতের অনুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। এ সকলের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের বহুল প্রচার এবং মনুষ্যের সর্ব্ব কর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা।

সুবুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ইহাও প্রতীতি করিতেন যে, তাঁহার নিজের বুদ্ধি ও নিজের শক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ও বিশ্ববিধাতা ঈশ্বরকেই দেখেন এবং তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিতেই জানেন। তাঁহার ধারণা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির কার্য্য ঈশ্বরের বিধানে পাঁচ জনে মিলিয়া করিবে, তিনি একাকী কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন না; কিছুতে বাধাও দিবেন না। সে জন্য তিনি মূর্ত্তিপূজাদিঘটিত, চিরপ্রচলিত পারিবারিক রীতির বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ না করিয়া আত্মজ্ঞান অনুসারে আপনি ঈশ্বরেরই ধ্যান ও চিন্তায় রত হইলেন। এবং সেই জ্ঞানের প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইহার আর একটু বিবৃতি আবশ্যক। ১৭৬৫ শকে যুবা দেবেন্দ্রনাথ সমবয়স্ক কতকগুলি লোককে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার এই রীতি প্রথিত রহিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কার্য্যে সকলের সাহায্য প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ—ইহা ভারত ভূমিতে প্রায় সর্ব্বগোচর। পৃথিবীর সকল দেশে বিভিন্নপন্থী উপাসকগণ ইতিহাসে বহু বিচিত্র ঘটনা উপস্থিত করিয়াছেন। সুশিক্ষার বিস্তারে এ সমস্ত তত্ত্ব লোকদিগের সুবিদিত হইতেছে। আবার বর্ত্তমানকালেও ঐরূপ নানা মতের উৎপত্তি হইবে না, এমন কে বলিতে পারে? দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রথম বয়সেই ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। তখন বেদের উপর যে নির্ভর ছিল, তাহা কতক অপগত হইলে, "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" ধর্ম্মের অনুসন্ধান হইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ মতবৈষম্য নিবারণার্থ পরিমিত কথায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। এই বিষয়ের আলোচনাতেই দেখাগেল, নানা তর্কের উদয় ও নানা মতের উৎপত্তি ক্ষান্ত করাযায় না। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রত্যয় আরো দৃঢ় হইল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য নির্ণীত হওয়া আবশ্যক; বিচার-বুদ্ধিতে মত বা সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা হইলেও তন্মধ্যে সেই মূলসত্য যেন অবিসম্বাদিত ও অবিচলিত থাকে। তাহাতে বেদবিচারে অপরা ঋগ্বেদঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রথমে নির্ণীত হইল যে, যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানাযায় তাহাই পরা বিদ্যা। এই তটস্থলাক্ষণিক শ্রুতিমন্ত্রটী ১৭৬৯ শকের বৈশাখ হইতে চারি বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শীর্ষ দেশে

বিন্যস্ত রহিল। অতঃপর উপাসনা কাহাকে বলাযায়, তাহা স্বল্পাক্ষরে ব্যক্ত হইল—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। পূর্ব্বমন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই বীজমন্ত্র ১৭৭৩ শকের অগ্রহায়ণে তত্ত্ববোধিনীর মস্তকে স্থাপিত হইল। পুনশ্চ চারি বৎসর পরে ১৭৭৭ হইতে দুই বৎসরে বর্ত্তমান কালের প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থল অধিকার করিয়াছে। ঈশ্বরের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের সম্মিলনে এই সার সত্য স্থিরীকৃত হইতে এত দিনের প্রয়াস আবশ্যক হইয়াছিল। এই কার্য্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা বিতর্কবুদ্ধিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন। শুভ বুদ্ধির উদয়ে সেই গোলযোগ ক্রমশঃ মিটিয়া গেল। কিন্তু ভক্তির প্রসারে বিঘ্ন দেখিয়া ঈশ্বরানুরাগী দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে বড় ব্যথা অনুভব করিয়া ছিলেন। তদতিরিক্ত তাঁহার ইহাও এক ক্ষোভের বিষয় ছিল যে, তিনি এত করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার উপাসনার আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বীয় পরিবারমধ্যে তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার ও দুর্গোৎসবের মহা আয়োজন করিতে হয়। এই শেষোক্ত কার্য্যে তিনি নির্লিপ্তভাবে থাকিতেন এবং পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোন উদ্যান বাটিকায় বা নদীর প্রবাহোপরি অবস্থান করিতেন। এদিকে "ঈশ্বর অনন্ত ও মঙ্গলময়

কি না” ইত্যাদি বিচারে ব্রাহ্মগণও তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিতে ছাড়েন না। তাহাতে তিনি অতি বিরাগে হিমালয় প্রস্থে চলিয়া গেলেন। * কিন্তু দেখাইতেছে যে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই ১৭৭৯ শকের বৈশাখ হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিস্ফুরণোপযোগী পরিপুষ্ট বীজমন্ত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোভূষণ রূপে বিধৃত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বেশ্বর, তথাপি তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের মতের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি কেমন সার্ব্বজনিক ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে সংকল্পারূঢ় ছিলেন, তাহার এই এক পরিচয়।

এই ঘটনাটী বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও নানামতাবলম্বী লোকদিগের সহিত তাঁহার মতের কতক কতক অনৈক্য উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি কেবল সহিষ্ণুতা ও উদারতা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দ্রোহ-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত

---

* সামান্য জমিদারী সম্পর্কে যাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পক্ষাধিক কাল গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, এবং এক্ষণকার জালমালাবৎ রেলপথের বিস্তারেও যাঁহারা দেশ ভ্রমণে কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, কি অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভাবে সেই বয়সে দেবেন্দ্রনাথ সুবৃহৎ জমিদারির কার্য্যভার অপরের হস্তে ফেলিয়া রেলযান-বিহীন দুর্গম পথে তুহিনাবৃত প্রদেশে একাকী দুই বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সদ্ভাব-পরায়ণ সাধুহৃদয়। তিনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও অনুগত জনের প্রকারান্তরে অধীন। ধর্ম্মের মূল সত্যের বিচারে সভ্যদিগের মধ্যে যখন বিসম্বাদ ও বিতর্ক উপস্থিত হইল, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ আচরণ না করিয়া এবং সকলের প্রাপ্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনি "ইতোগমিষ্যাম্যথবেতি" ভাবিতে লাগিলেন।

এই লক্ষণ দেবেন্দ্রনাথের চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া রহিল। শ্রীমন্মহর্ষি এই জন্যই পর্ব্বতবাসী ও বনবাসী। এই জন্যই তিনি দ্বন্দ্ব-বিবাদময় জনসমাজ অপেক্ষা মূক ও জড় প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়া লোকালয়বর্জ্জিতস্থানে বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছেন।

ইহার পর পুনশ্চ যখন ব্রাহ্মসমাজের নানা প্রকার উন্নতির মধ্যে বিকৃতগতি আরম্ভ হইয়াছিল, তখন শ্রীমন্মহর্ষি দেখিলেন, মনুষ্যের প্রবৃত্তিস্রোত ও স্বার্থপরতা বড়ই প্রবল; সাংসারিক নানাপ্রকার বিষয় ভোগের মধ্যে ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যবিন্দু করিয়া চলা কঠিন কর্ম্ম। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবিকৃতভাবে প্রচার করা সহজ নহে; জীবনের সকল কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঠিক রাখা সাধনার বিষয়। সেই সময়ে তাঁহার কিংকর্ত্তব্য বিষয়ে ঘোর চিন্তার উদয় হয়। এই চিন্তার আবেগে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া তাঁহাকে পুনশ্চ নির্জ্জন প্রান্তর নদী কানন ও পর্ব্বত আশ্রয় করিতে হইয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় শ্রীমন্মহর্ষি দুর্গোৎসবাদির সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদীতে ভ্রমণ করিতে যাইতেন; কখন বা কলিকাতার সন্নিহিত এক এক উদ্যানে বাস করিয়া কিছু দিন নির্জ্জন চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। পদ্মানদী তাঁহার প্রথম সময়ের ভ্রমণ স্থান। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি এই দিগন্তপ্রসারিণী নদীর ভীষণ ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া তদুপরি সামান্য তরণীযোগে বিচরণ করিতেন। তাহার পর হিমাচলের মধ্যস্থিত কখন মরি পর্ব্বতে, কখন ধর্ম্মশালা নামক শৈল শিখরে, কখন বাক্রোটা পর্ব্বতের উচ্চচূড়ায়, কখন হিমগিরির অত্যুন্নত শৃঙ্গ-সন্নিহিত দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে, কখন ব্রহ্মপুত্র নদে, কখন বঙ্গোপসাগরে, কখন বা প্রশান্ত মহাসাগরে তিনি অবিরাম ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সকল প্রাকৃতিক বিচিত্র শোভাময় স্থানে অদ্ভুত ও শান্তিরসে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিত। সকলেই অনুমানে বুঝিতে পারিবেন যে, অচিন্ত্য অনন্ত ঈশ্বরের তেমন আশ্চর্য্যজনক বিশ্বরচনা নিরন্তর দর্শন করিয়া যিনি অতুল তত্ত্বরস-সমন্বিত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার পক্ষে জনকোলাহলের মধ্যে আসিয়া অল্পমতি লোকদিগের সহিত বাদানুবাদ করা কতই অরুচিজনক।

তথাপি শ্রীমন্মহর্ষি যেরূপ স্বভাবতঃ লোকহিতৈষী;—বিশেষতঃ তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপর লক্ষণ দেখিয়া এমনও বোধ হইতেছে যে, এই নির্জ্জন বাস মধ্যে তাঁহার এই চিন্তা প্রবল থাকিত যে, কিসে মঙ্গলময় প্রেমময় অনন্ত ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রতি লোকের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়; কিসে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির অন্তরায় সকল অপসারিত হয়; কিসে এদেশের বর্ত্তমান অশেষ দুর্গতি দূর হয়; এবং কিসে লোকের ঐহিক ও পারত্রিক যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়।

আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে—যখন শ্রীমন্মহর্ষির বিশুদ্ধচিত্ত লোকহিতসাধনের জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এত ব্যাকুল, তখন সংসার বিষয়ে তাঁহার নির্লিপ্ততাও তেমনি প্রবল। যদি আমার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে—সংসারের মঙ্গলসাধন পক্ষে কিছু ভাল কার্য্য হয়, তবে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যাই; নতুবা আর স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না,—এরূপ তাঁহার আন্তরিক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এক যাত্রায় যিনি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, সেই বন্ধুর মুখে শুনা গিয়াছে, উদাসীন ভাবে ভ্রমণ করিতে তাঁহার যেরূপ আনন্দ জন্মিত, সেরূপ আনন্দ আর কিছুতে হইত না।

শ্রীমন্মহর্ষির চরিত প্রসঙ্গে তাঁহার ১৭৭৯ ও ১৭৮০ শকের শিমলা পর্ব্বত ভ্রমণ উপলক্ষে এক সাধক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—["আচার্য্য কেশবচন্দ্র" আদি, ২৭ পৃঃ।]

"দুই বৎসর কাল এইরূপে নির্জ্জনে বাস করিয়া তাঁহার মন নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। এই নির্জ্জন-প্রিয়তা আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি পাঁচ সাত ঘণ্টা কাল অনায়াসে নির্জ্জন চিন্তায় অতিপাত করেন। হিমালয় পরিত্যাগের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে তিনি শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিতে যান। এই উৎপত্তি স্থান দর্শনে তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। নদী আপনার উৎপত্তি-স্থানে বদ্ধ না থাকিয়া ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়া কত দেশের উপকার সাধন করিতেছে, ইহা ভাবিয়া তিনি আপনার প্রাপ্ত যোগসম্পৎ আপনাতে অবরুদ্ধ রাখা অন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু শতদ্রু-প্রবাহ উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া ক্রমে কলুষিত-সলিল হইয়া গিয়াছে। সংসারে গিয়া তাঁহারও এইরূপ হইবে, ইহা ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু প্রাপ্ত সম্পৎ বিতরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা আর তাঁহাকে হিমালয়ে বদ্ধ থাকিতে দিল না; তাঁহাকে স্বদেশ ফিরাইয়া আনিল।"

অদ্ভুত প্রভাব যুক্ত এই সকল জল ও স্থল শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের তীর্থ স্বরূপ হইয়াছিল। তীর্থ বাস করিলে লোকের শরীর ও মন পবিত্র ভাব ধারণ করে, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাঁহার নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই মহাত্মাও সেইরূপ নূতন উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে

প্রত্যাগমন করিতেন। নবতর এই "ব্রাহ্মতীর্থ" হইতে আসিয়া বারে বারে তিনি নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

তীর্থবাসী শ্রীমন্মহর্ষির ইন্দ্রিয়সংযম, পাপপ্রশমন, চিত্তের বিশুদ্ধি করণ, আত্মতত্ত্বের, মনুষ্যত্ত্বের ও সৃষ্টি মাহাত্ম্যের ধ্যান ধারণা এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ইত্যাদি ধর্ম্মসাধনার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাঁহার কথায় ও উপদেশে, তাঁহার বক্তৃতায় ও ব্যাখ্যানে এবং তাঁহার মুখাবয়বে ফুটিয়া পড়িত। তাহাতে তাঁহার সংসর্গে ও তাঁহার অনুসরণে ব্রাহ্মগণ সুমহৎ সাধু সঙ্গের ফল প্রাপ্ত হইতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনপ্রক্রিয়াতে বিদ্যুদ্বৎ দেবদর্শনের বা মনুষ্যের কোন অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়ার মোহিনী শক্তি প্রচারিত হয় নাই; পারলৌকিক অত্যুগ্র সুখের লোভ বা শাস্তির বিভীষিকা প্রদর্শিত হয় নাই। এই ধর্ম্মের সাধনায় কোন দুশ্চর তপোনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক হয় না; এবং পাপপ্রসক্তির কোন অলক্ষিত গূঢ় আশ্রয় থাকে না। ইহাতে গুরু, পুরোহিত, রাজা, দৈবজ্ঞ বা কোন স্বপ্নসঞ্চারী অলক্ষ্য পুরুষের প্ররোচনার ও প্রভাবের অপেক্ষা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্ত প্রকৃতিসিদ্ধ, সরল, অথচ সর্ব্বপাপহারী। সুব্যক্তা প্রকৃতির সুবিমল রসগ্রাহী সুরুচিবান্ সৎপুত্র

শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথের নিষ্কাম হৃদয়ের অহৈতুকী ভক্তিপ্রভাবে এই সহজ ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৭৮০ শকে ঋষিধর্ম্মী দেবেন্দ্রনাথ হিমাচল হইতে প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্মসমাজের এক নব অভ্যুদয় হইল। কার্ত্তিক মাসে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮ পৌষ হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রায় প্রতি বুধবারে বক্তৃতা দ্বারা আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ইত্যাদি বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যুবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের উপদেশার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক তিনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত এক ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিলেন।* তিনি ধ্যানচিন্তায় যে যোগসম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন, ১৭৮২ শকে তাহা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে বক্তৃতা আকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত

---

* সিন্দুরিয়া পটিস্থিত গোপাল মল্লিকের বাটিতে রবিবারের প্রাতঃকালে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কার্য্য ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ হইতে চলিতে থাকে। ১৭৮২ শকের ৩১ বৈশাখ এবং ১৭৮৫ শকের ৮ চৈত্র আরম্ভ হইয়া দুইবারে ভবানীপুরে কয়েক মাস ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ হয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে সর্ব্বদা সার্ব্বজনিক করিবার প্রয়াসে দেবেন্দ্রনাথ নানা লোকের অধিকারে এই সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য রাখিয়াছিলেন। বিবিধ বিধানে ব্রহ্মমন্ত্র ক্রিয়াশীল হইল।

হইল। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মমর্ম্ম অতি বিশদ রূপে বোধগম্য হইল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজনিহিত মত ও বিশ্বাস স্পষ্টতর রূপে পরিব্যক্ত হইল। ১৭৮৩ শকের শেষে এই শেষোক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

এই চেষ্টায় কতকগুলি যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে প্রতিপালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থাবলম্বনে জ্ঞানচর্চ্চার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথ ব্যাখ্যান দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়াদিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি পরিবারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের সমস্ত জীবনকে অনুশাসিত করিবে, তাহার উপক্রম হইল। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডকে পৃথক্ রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আচার্য্য নিত্যযুক্তজ্ঞানধর্ম্মকে একত্র প্রতিপালন করিরার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নির্জ্জনতাপ্রিয় উদাসীন-স্বভাব দেবেন্দ্রনাথ গৃহে থাকিতে একান্ত অনিচ্ছু। তাঁহার মনোনুকূল তীর্থ যাত্রায় তাঁহার শ্রান্তি বোধ হয় না। তিনি ১৭৮০ শকের কার্ত্তিক মাসে হিমাচল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন; ১৭৮১ শকের ১২ আশ্বিন কলিকাতা হইতে সমুদ্র-পোতারোহণে

সিংহল যাত্রা করিলেন। তিনি পর্ব্বতমালার মধ্যে ঈশ্বরের বিশ্বরচনার বিচিত্র শক্তি অবলোকন করিয়াছেন। এক্ষণে সাগর-তরঙ্গে তাঁহার মহিমা অনুধ্যান করিতে একান্ত ব্যগ্র হইয়া ছিলেন। এই যাত্রায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। এই যুবকদ্বয়ের উপর দেবেন্দ্রনাথের অনেক আশা জন্মিয়াছিল। এই উদ্যমে তিনি দেখিলেন, ইহারা তাঁহার শিষ্যত্বের যোগ্য কি না? অর্থাৎ তাঁহারা সমুদ্রোপরি ভ্রমণে তাঁহার তুল্য প্রেমানন্দ অনুভব করিতে পারেন কি না?

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি নানা বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে সিবিল সার্বিস্ নামক উচ্চ পদ লাভের উদ্দেশে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই কর্ম্মে ভারতবাসীদিগের আর এক দিকে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

১৭৮৩ শকের শেষভাগে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বারা তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগসম্পৎ বিতরণের কার্য্য এক প্রকার সমাপ্ত করিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট করিবার সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইলেন। লৌকিকী বিদ্যা শিক্ষা, পারমার্থিক জ্ঞানচর্চ্চা, বৈবাহিক অনুষ্ঠান, দুর্ভিক্ষনিবারণ চেষ্টা, প্রভৃতি

মনুষ্যমণ্ডলীর সকল আবশ্যক হিতকর কার্য্য ব্রহ্মের উপর দৃষ্টি স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন, আমার কর্ম্ম ফুরাইল। অতঃপর তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কলিকাতার অতি দূরে কোন এক নিভৃত স্থানে একাকী চিরদিনের

---

* ১৭৬৫ শক অবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মেরা গীতা ও উপনিষৎ পাঠ দ্বারা নিত্য ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। ১৭৭১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ হইলে তাহাই তাঁহাদের নিত্য অধ্যয়নের গ্রন্থ হইয়াছিল। ১৭৮১ শকে উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি পুনঃপুনঃ প্রচারিত হইল। বিধি পূর্ব্বক প্রাত্যহিক উপাসনা চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ আপনার গৃহে পরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ ব্রহ্মোপাসনার বিধান করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিত্য ও নৈমিত্তিক সমুদায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মকর্ম্ম ব্রাহ্মোপাসনা সহকারে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ১৭৮৩ শকের ১২ শ্রাবণ দেবেন্দ্রনাথ হোমাদি ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া স্বীয় দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। তদবধি ব্রাহ্মমতে ক্রিয়ানুসন্ধান একটী বিশেষ ব্রাহ্মলক্ষণ বলিয়া গণ্য হইল। এক্ষণে আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার পারিবারিক উপাসনায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর প্রেমের সুখদ সংমিশ্রণ দেখাযায়। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে শ্রীমন্মহর্ষির জমিদারির মধ্যেও ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সাম্বৎসরিক পুণ্যাহ কৃত্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন তাঁহার কোন মঙ্গলাচার বা শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না।

মত অবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করেন। তাহার ফল এই শান্তি-নিকেতন আশ্রম।

১৭৮৩ শকের শীতকালে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া এই স্থানের নিকটবর্ত্তী ঘুস্করার এক প্রশস্ত মাঠের মধ্যে তাম্বু খাটাইয়া তাহাতে অবস্থিতি করেন। তথায় চতুর্দ্দশ সহস্র আম্র বৃক্ষের এক বৃহদায়তন বন বা উদ্যান ছিল। শ্রীমন্মহর্ষির এই কৃত্রিম বন ভাল লাগিল না। মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্র বাঁধিবার নিমিত্ত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করে, তেমনি তিনি স্থির নির্জ্জন বাসের উপযোগী এবং ঈশ্বরধ্যানের অনুকূল প্রকৃতির হস্তরচিত কোন এক স্থানের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বৃক্ষপল্লব শূন্য মনুষ্য-সঞ্চার-বর্জ্জিত দিগন্তপ্রসারিত ভুবনডাঙ্গা নামক এই প্রান্তর তাঁহার মনোমত হইল। তদবধি এখানে এই আশ্রমের পত্তন হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা কতকগুলি বৃক্ষের ছায়ায় সমাবৃত এবং মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। ১৭৮৪ শকের (১২৬৯ শালের) ১৮ই ফাল্গুন এই স্থানের মৌরসী পাট্টা গৃহীত হয়। *

* এই সময় কলিকাতায় শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতা কলেজ স্থাপন করেন। ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৬৩। ৮ এপ্রিল খৃষ্টান মিশনরিদিগের আপত্তি খণ্ডনার্থ তৎকর্ত্তৃক **Brahmo Somaj Vindicated** বক্তৃতা হয়।

আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ ত্যাগশীল। তিনি সংসারের সহিত নির্লিপ্ত থাকিতেই সমধিক অনুরাগী। তিনি যখন দেখিলেন যে, কতকগুলি ব্রহ্মনিষ্ঠ যুবাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের সকল অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন তিনি মনে করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার যত্ন ও চেষ্টার আর বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমার অবসর লাভ হইল। এই প্রত্যয়ে বাস্তবিক তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইবার উপক্রম করিলেন।

যুবা ব্রাহ্মগণ সকলেই কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠ। বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের অগ্রণী। শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, এই কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিতে থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল প্রচার এবং তদ্দ্বারা জন সমা-সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে। তদনুসারে তিনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে নিয়োগ করিয়া তাঁহার প্রতি সমস্ত কর্ম্মভার অর্পণ করিলেন।

১৭৮৪ শকের বৈশাখ হইতে ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র উপরোক্ত অধিকারে ব্রাহ্মসমা-জের মধ্যে অব্যাহত রূপে কর্ম্ম করিতে থাকেন। এই সময়ে শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের এই শান্তি নিকেতনের বৃক্ষাদি অর্জ্জিত এবং আশ্রম-বাটিকা নির্ম্মিত হয়।

অতঃপর আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কার্য্যে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। স্বভাবতঃ অদ্রোহী দেবেন্দ্রনাথ কেশব চন্দ্রকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু বুঝিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অবিকৃত ও বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষণ ও উন্নতি সাধন করা অল্প-বয়স্ক লোকদিগের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত হইবে না। অতএব তিনি স্বয়ং আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণ ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন।

পূর্ব্বে স্কুল ও কলেজ প্রকরণে ইয়ুরোপীয় বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হইলে পৃথিবীস্থ নানাদেশের রীতি নীতির প্রতি অনুরাগী হইয়া এদেশীয় যুবকবৃন্দ চলচিত্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। যখন ইহাদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়াছিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে আস্থাবান করেন। তদবধি এই ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা দ্বারা বঙ্গদেশীয়-গণ আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বদেশীয় রীতি অনুসারে ধর্ম্মপালন ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে তৎপর ছিলেন। এক্ষণে আর একদল যুবক অভ্যু-খিত হইতেন, যাঁহারা সভ্যতার নামে বিদেশী রীতিনীতির অধিক অনুরাগী। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মবোধে, কর্ত্তব্যবোধে, যিনি যাহা করিবেন,

তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় পরিশেষে অবশ্যই মঙ্গল ফল প্রসূত হইবে। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি কার্য্য করিতে লাগিলেন। আপনি উপনিষৎসেবী ঋষিদিগের শান্তিপ্রদ পন্থা ধরিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পৃথক্‌রূপে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অধিকার ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল পুরাতন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা একত্র হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বজনিকউদার ভাব রক্ষা পাইল। ভাব ও গতির বৈচিত্র হেতু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মসমাজ সে সকলেরই আশ্রয় ও অবলম্বনীয় রূপে প্রতিপন্ন হইল। শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের জীবন ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ স্বরূপ রহিল। তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও শিষ্যগণ সমস্ত পৃথিবীতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। অথচ স্বদেশীয় রীতি নীতির উচ্ছিন্ন হইবার ভয় বিদূরিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নানা প্রকরণ অবলম্বন করিলেন। পুনঃ পুনঃ বৃহৎ সভা, ক্ষুদ্র সমিতি ও রাজদরবার চলিতে লাগিল। নানা প্রকার দলবন্ধনের ও সম্প্রদায়-সৃষ্টির সূচনা হইল। শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথ বুঝিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ভাবে ও এক নামে প্রচারিত হইবে না; ব্রাহ্মসমাজের একই গঠন থাকিবে না। অতএব তিনি মূল আদর্শ স্বরূপ আদি ব্রাহ্মসমাজের

প্রকৃতি রামমোহন রায়ের পত্তন অনুসারে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

শ্রীমন্মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের এই সুগতি সম্বিধান জন্য পুনশ্চ নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি ১৭৮৭শকের জ্যেষ্ঠ হইতে মাসে মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী এইরূপে পুনরায় শ্রীমন্মহর্ষির সাধু সংসর্গে ও তাঁহার বিতরিত জ্ঞানের অন্নে পরিপুষ্ট হয়েন।

এই সময়ে আর একটী বিষয়ের বড় অভাব ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অর্থাৎ উপনিষদংশের তাৎপর্য্য দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ নীতি অংশের তাৎপর্য্য এপর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এই সময়ে এই অভাবের পূরণ হইল। ১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে লাল এবং কাল বর্ণের অক্ষর যুক্ত তাৎপর্য্য সমন্বিত সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে যাহা অল্প বা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহারও পরিপূরণ হইল। এইরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

এই কার্য্যের সময় শ্রীমন্মহর্ষি অবকাশ পাইলেই এই শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেন। তন্নিমিত্ত ইহার "শান্তি-নিকেতন" নাম এই সময়

অবধারিত হয়। এখানে নির্জ্জন চিন্তায় তিনি যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিদিত হইতেন এবং ধর্ম্মের যে উদার ও মহৎভাব উপলব্ধি করিতেন, তাহারই ফল ঐ আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্যাপক ও উচ্চ আদর্শ। আমরা এই জন্য শ্রীমন্মহর্ষির এই আশ্রমবাসকে তাঁহার অন্যান্য তীর্থ বাস অপেক্ষা শ্লাঘনীয় বিবেচনা করি। এই আশ্রমবাসে উক্ত মহাত্মা সংসারের গতি, মনুষ্যের প্রকৃতি ও বিকৃতি, ধর্ম্মের শান্তিদাতৃত্ব এবং পরমার্থতত্ত্বের অন্যান্য নিগূঢ় ভাব স্পষ্টতর রূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বলোকের জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজকে অচলপ্রতিষ্ঠ এবং কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের আরাধনার স্থান করিয়া রাখিয়া দিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীমন্মহর্ষি ১৭৯১ শকের শেষে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। তদবধি আর আমরা তাঁহার 'নাগাল' পাই না। তিনি ক্রমাগত শৈলশিখরে ও নদীর প্রবাহে ও সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিয়া আপনার পূর্ব্বানুভূত শান্তিরস গাঢ়তর রূপে উপভোগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কোথায়?—তাঁহা শুনিবার নিমিত্ত কর্ণ পাতিয়া থাকি। কখন শুনি তিনি অমৃতসরে, কখন শুনি তিনি ধর্ম্মশালায়, কখন শুনি তিনি বাক্রোটা শিখরে! মধ্যে মধ্যে যদি তাঁহার কলিকাতায় পদার্পণ হয়, সে কেবল কিয়দ্দিনের জন্য। এক সময় আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ

বাহিয়া তিব্বত দেশাভিমুখে গমন করিতেছেন; কখন বা শুনি, তিনি চীনদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসিতেছেন। কখন বা শুনিতে পাইলাম, তিনি বোম্বাই নগরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রকূলে বসিয়া "প্রফুল্লিত কানন গিরি নদী সাগর" এবং "অযুত অগণ্য লোক" দর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই পরিব্রজন ও পর্ব্বতবাসাদি ব্যাপারকে আমরা তাঁহার তীর্থভ্রমণ ও তীর্থবাস রূপে গণনা করি। অদ্ভুত ও চমৎকৃতিজনক এই সকল স্থানের নির্জ্জন চিন্তায় এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির বিশুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি কি প্রকার নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং কি প্রকার বিশ্বপ্রেমের উদয় হইয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ব্রাহ্মদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারে বিদিত হয়। ইহাই এই ব্রাহ্মতীর্থের বিশেষ মাহাত্ম্য বলিতে হইবে।

ভারতীয় দর্শনকার ঋষিদিগের ন্যায় গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণের তর্কতরঙ্গে যখন সেই পশ্চিম ভূভাগে ঈশ্বরবিষয়ক মতের চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, তখন মহাত্মা ঈশা প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, আমি ঈশ্বরের পুত্র; অর্থাৎ পিতার সহিত পুত্রের যেমন অচ্ছেদ্য ও অবিয়োগ্য ও প্রিয় সম্বন্ধ, মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ নিশ্চিত, অচল ও প্রিয় সম্পর্ক। ইহার অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পরে মধ্যদেশে

হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব হইল। তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের দোষ সংশোধন নিমিত্ত বলিলেন, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, সেবক ও সহচর। ইহাতে ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ধর্ম্ম বিধানের নিশ্চিততা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গভূমিতে শ্রীমচ্চৈতন্য দেব যখন দেখিলেন "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" ইত্যাদি বাক্য পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে কতক আলোচিত হইয়া অর্দ্ধবিদ্যায় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কুলষিত করিয়া ফেলিতেছে, তখন তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা উদ্ঘোষিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণে বলিলেন, এই সমস্ত জগতে তিনি লীলা বিহার করিতেছেন। তাঁহার শিষ্যেরাও বুঝাইলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ; কিন্তু সে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।

উপরোক্ত প্রকারে যে ধর্ম্মবিশ্বাস পৃথিবীতে মনুষ্য মণ্ডলীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই স্থিরতা ও প্রকর্ষ সাধন জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়। শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের উল্লিখিত তীর্থভ্রমণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সমুদায় পৃথিবীর অনুকৃতি। শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথ এই ভারতবর্ষের ঊর্দ্ধ অধঃ ও চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ম্মল ও গভীর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া অচিন্ত্য অনন্ত বিশ্বরচয়িতার অস্তিত্ব ও মঙ্গলময় ভাব সুস্পষ্টরূপে অনুভব

করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার বক্তৃতায় ও ব্যাখ্যানাদি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি হাফেজের একটী বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য দুইলোক চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি আমি এবং আমার চক্ষু নিরন্তর তোমার অধীন হইয়া তোমাকে দর্শন করিতে থাকিবে।"

কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি পৃথিবীর বর্ত্তমান সকল তীর্থ-ক্ষেত্রের অসংখ্য দেবালয়ে নিয়ত যে পূজোৎসব হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেমন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কৃতার্থন্মন্য হয়েন, এই মহর্ষিও তুষার-মণ্ডিত হিমাচলের এক উচ্চ চূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধে অধোতে বিশ্বব্যাপ্ত, ঐশ্বরিক মহিমাপূর্ণ, সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যের মধ্যে সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে জ্বলন্ত জীবন্ত অনন্ত দেবের অনন্ত পূজোৎসব দর্শন করিতেন। সন্ধ্যাকালীন আরত্রিক উৎসবে উক্ত তীর্থ সকলে সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বালিত হইয়া থাকে; শ্রীমন্মহর্ষি—

"গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে" ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া প্রতিক্ষণে সদা-বিরাজিত ততোধিক সুন্দর ও পবিত্র আরত্রিকোৎসব-ঘটা সন্দর্শন করিতেন।

যিনি এতদ্রূপ তীর্থক্ষেত্রে এই ভাবে জীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের কেমন ভক্ত, কেমন সুপুত্র, কেমন সেবক। ঈশ্বর সেই নিষ্ঠাবান্

সাধু সেবকের দ্বারা মনুষ্যের অনন্ত সুখের মূল, মুক্তির নিদান, নির্ম্মল, প্রকৃতিসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার সম্পন্ন করিবার জন্যই তাঁহাকে প্রথম বয়স অবধি উক্ত প্রকারে তীর্থবাসী করিয়াছেন। অথবা এমনও বলা যায়, ঈশ্বর তাঁহার সেই বিশ্বাসী ভক্তকে উপরোক্ত প্রকারে তীর্থ-বাসাশ্রিত করিয়াই বিশ্বজনীন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত অধিকারী করিয়াছেন।

শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের উদার বিশ্বপ্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

আদিব্রাহ্মসমাজ শ্রীমন্মহর্ষির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর। ইহার যে উপাসনা-পদ্ধতি তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের ফল। উপনিষদাদি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি সেই সকল শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিদিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। এ দেশের প্রচলিত রীতি নীতির মধ্যে যাহা একান্ত দোষাশ্রিত নহে, তাহা রক্ষা ও পালন করিতে তিনি একান্ত যত্নবান্। কিন্তু সম্প্রতি যাঁহারা ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইতেছেন, তাঁহারা সকলে সেরূপ নহেন। এ জন্য তাঁহার ব্যবহারের সহিত অপরাপর ব্রাহ্মদিগের ব্যবহারে বহু বৈষম্য লক্ষিত হয়। তথাপি শ্রীমন্মহর্ষি সকলের প্রতি উদার স্নেহের চক্ষুতে দৃষ্টি করেন। তাঁহার নিজের (আদি) সমাজের প্রতি যাঁহারা বিরূপভাবাপন্ন, তিনি তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকারে

বিরূপ নহেন। পূর্ব্বাপের ব্রাহ্মসমাজ-ঘটিত নানা আন্দোলনে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের হৃদয়ের এই উদার প্রেম অটল ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।*

দেবেন্দ্রনাথ যখন কেশবচন্দ্রকে পৃথক সমাজ করিবার পরামর্শ দেন, তথনই তাঁহার দূর-দৃষ্টিতে অনুভূত হইয়াছিল যে, লোক-মোহন-অদ্ভুত ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত, সহজজ্ঞান-সঞ্জাত এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মগণ চিরদিন এক ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজের এক নাম বা এক আকার থাকিবে না। মনুষ্যের রুচি-ভেদে তাহার কার্য্যেরও প্রকার-ভেদ হইবে। ফলেও তাহাই হইল। তিন বৎসর না যাইতে যাইতে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্রের সমাজ প্রধানতঃ "নব-বিধান সমাজ" নামে প্রখ্যাত, অথচ পারিবারিক ও দরবারিক এই দুইভাগে বিভক্ত হইল। তাহাতে ১১ মাঘের সাম্বৎসরিক উৎসব প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কীয় কয়েকটী চিহ্ন মাত্র অবশেষ রহিল। অপর এক সমাজ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম ধারণ করিল। পরন্তু এ সকল

* কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ হইতে পৃথক হইয়া ও তাঁহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত একত্র হইতেন এবং সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

সমাজের সভ্যেরাই শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে "ধর্ম্মপিতা" জ্ঞান করিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা কোন কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া শ্রীমন্মহর্ষিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান এবং তদ্দ্বারা আপনাদের পার্থক্য অথচ মূলে ঐক্য প্রদর্শন করেন। সেই সেই অভিনন্দন-সভায় প্রত্যভি-নন্দন কালে উক্ত মহাত্মা তাঁহাদিগের নিকট আপনার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের সার সত্য এবং আপনার জীবন সম্বন্ধে কোন অপ্রকাশিত কথা এমন মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত করেন এবং এমন সপ্রেমে আশীর্ব্বাদ করেন যে, তাহাতে কোন রূপেই অনুভূত হয় না যে, এই সকল ব্রাহ্ম তাঁহার পরিপোষিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মতের কোন অংশে বিরোধী বলিয়া তাহার মনে আছে। বস্তুতঃ তিনি একান্ত উদারচিত্ত সাধু পুরুষ। তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, যিনি যাহা করুন, শেষে মঙ্গলময় ঈশ্বরের হস্তে সকলই মঙ্গলে পরিণত হইবে।*

---

* মহাত্মা রাম মোহন রায় যে নির্দ্বন্দ্বতার পত্তনে ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এইরূপ সদ্ভাবের প্রসার করা ঋষিধর্ম্মী দেবেন্দ্র নাথের এই সকল ঘটনাসঙ্কুল জীবনের সুসাধু ফল বিবেচনা করিতে হইবে। এই ঋষিধর্ম্মোদিত ব্রাহ্মসমাজের উদারতার সহিত খৃষ্টীয় সমাজের ইতিহাসের অগ্নিকাণ্ড সকল স্মরণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিশেষ বিদিত হয়।

১৮১৮ শকে শ্রীমন্মহর্ষি যখন চুঁচড়ায় গঙ্গাতটে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এই উপলক্ষে চুঁচড়ার গঙ্গার জল ও কুল ব্যাপিয়া এক সভামণ্ডপ রচিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি উক্ত মহাত্মার অন্তঃ-করণে কি উদার প্রেম সঞ্চিত, তাহা এই সুসজ্জিত সভার আয়োজনে বিদিত হইয়াছিল। এই সভায় অভিনন্দনের প্রত্যভিনন্দনে শ্রীমন্মহর্ষি যে উপদেশ প্রদান করেন, একত্র তেমন নৈতিক উপদেশ, আর কখন তাঁহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয় নাই। তাহা এ দেশের নৈতিক ও সামা-জিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে অমূল্য। এই উপদেশ এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার বহু সহস্র পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে।

আমরা এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষির জীবন চরিতের কিয়দংশ আলোচনা করি-লাম। ৭ পৌষ দিবসকে কেন আমরা শ্লাঘনীয় বিবেচনা করি, তাহার কতক আভাস ব্যক্ত হইল। সমস্ত এবং বিশেষ ইতিহাস বলিবার এ অবকাশ নহে। শ্রীমন্মহর্ষির ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনার গূঢ় তথ্য বলিবার আমার ক্ষমতা নাই। কিন্তু বাহ্য লক্ষণে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার সাধনার কঠোরতার পরিচয় হয়। এ

বিষয়েও আমার অধিক কথা না বলিলেও চলে। এই যে মহাপ্রান্তর চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে, ইহার মধ্যে যখন এই আশ্রম গৃহ ও চতুষ্পার্শ্ব-জাত বহু শ্রমার্জ্জিত বৃক্ষাবলী কিছুই ছিল না। তখনকার প্রাকৃতিক শূন্যময় ভাব এবং তথায় রাজৈশ্বর্য্যশালী এক জমিদারের একাকী অবস্থান চিন্তার চক্ষুতে দর্শন করুন। এই স্থানের শীতবাতে দুই দিন অবস্থান করিয়া আমরা ক্লিষ্ট হইতেছি। গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপে এ স্থানে বাস করা ততোধিক কষ্টকর। কিন্তু তপোনিষ্ঠ শ্রীমন্মহর্ষি এই স্থানে কেবল একটী কুটীর এবং দুই একটী বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় ও তপঃসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। শীতের দুঃসহ কম্পনকারী বায়ু, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাঘাত, এ সকল আধিভৌতিক ব্যাপার তাঁহার দেহকে পীড়ন করিলেও চিত্তক্ষেত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই তপস্যাক্ষেত্রে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ আপনার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া এবং ইন্দ্রিয়সেব্য শব্দস্পর্শাদির সুভোগ ও সৌখিনতা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মরূপ হোমাগ্নিতে আপনার সুখপ্রয়াসকে আহুতি দিয়াছিলেন।

আমরা এই পর্য্যন্ত অনুভবে বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই উক্ত মহর্ষির তপস্যার ও তীর্থবাসের ভাব সম্যক্ জানাযায় না। রাজযোগ্য মর্য্যাদা, সুখ ও সম্পদের

পরিবর্ত্তে এই মহাপুরুষ কেমন করিয়া গিরিশৃঙ্গে ও নদীবক্ষে ভ্রমণ ও তথায় বাস জনিত ক্লেশপরম্পরা সোৎসাহে অম্লান বদনে সহ্য করিতেন, এবং ভৃত্যের হস্তে সহস্র মুদ্রা থাকিলেও আপনি উদাসীনের ন্যায় জীর্ণ ভগ্ন পান্থশালায় যথালব্ধ আহার দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া অন্তঃস্ফূর্ত্তি আনন্দে বিশ্বব্যাপী মহান্ ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রদান করিতেন, ইহার অল্পই তথ্য জনসমাজের গোচর হইয়াছে। পরিশেষে তিনি এই বৃক্ষগুল্মলতাদি বিহীন কঙ্করময় স্থানকে আপনার সাধন যোগ্য তীর্থবাসের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। যদি এমন সুযোগ হয়, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও তীর্থবাসবৃত্তান্ত, সমুদায় না হউক, কতক কতক লিপিবদ্ধ হইয়া কোন না কোন আকারে প্রকাশিত হইবে।

ইহা সুপ্রথিত যে, কোনধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। সকল প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান। শ্রীমন্মহর্ষি নানা দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে কোন উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মমন্দির অথবা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মালোচনার স্থান দর্শন করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য উপাসকগণের সহিত তিনি সপ্রেমে আলাপ করিতেন এবং তাহাদের জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমুদয় পরিচয় জানিয়া লইতেন। যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অর্থদান দ্বারা তিনি সকল মতাবলম্বী সাধুগণের সমুচিত সম্মাননা করিয়াছেন।

পঞ্জাবের অমৃতসরে শিখসম্প্রদায়ীদিগের স্বর্ণমণ্ডিত উপাসনালয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ়-ভক্তি-সহকৃত বিরামরহিত, ভজনসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পাপ ক্ষালনের আন্তরিক অনুতাপ ব্যঞ্জক গভীর-বিষাদ মিশ্রিত প্রায়শ্চিত্ত বা শান্তিক্রিয়া দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহর্ষি যে পরমার্থ ভাব ও বিমলানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, না জানি তাহার সমস্ত তীর্থবাসের ইতিবৃত্তে ঐরূপ কতই বিশুদ্ধতত্ত্ব ও আনন্দবার্ত্তা সুব্যক্ত হইতে পারিবে।

আমরা পূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের ভজন ও সাধনে দেবেন্দ্রনাথ এক স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি কোন মহৎ ব্যক্তির অনুশাসন পালন বা কোন সাধু পুরুষের অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মের মূল উপাদান মাত্র দেখাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মধ্য হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্কর্ষণ করা এক প্রকার নূতন ব্যাপার। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের অস্ফুট বাণী বা ইঙ্গিতমাত্র পাইয়া কালে কালে অল্পে অল্পে সমীচীন বিচার ও অভিজ্ঞতা সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বা মূলমন্ত্র নির্দ্ধারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ বিধি প্রবর্ত্তন এবং সেই মতে সকল গার্হস্থ্য ও পারিবারিক কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বিরচন,—এই সমস্ত আবশ্যক কর্ম্ম সমাধা করিয়া

এই ধর্ম্মকে সর্ব্বাংশে সামাজিক মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিলেন। সেই ধর্ম্মের অনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত একটা নির্জ্জন স্থানে সচ্ছন্দে কিছুকাল বাসকরা আবশ্যক। শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ আপনার উদাহরণে এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তিনি আপনার এই সাধনার স্থানকে সকল সাধু সাধক-দিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ১৮০৯ শকের (১২৯৪ সনের) ২৬এ ফাল্গুন এই সাধনাশ্রমের উৎসর্গ পত্র লিখিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই :—

১। "উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে।"

২। "নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না।"

৩। "ধর্ম্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস আনয়ন বা আমিষ ভোজন বা মদ্যপান-ঐ স্থানে হইতে পারিবে না।"

৪। "কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমানন৷ ঐ স্থানে হইবে না।"

৫। "এইরূপ উপদেশাদি হইবে, যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাদি ধ্যান ধারণার উপযোগী

হয় • এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বৰ্দ্ধিত হয়।”

৬। “কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না।”

৭। “ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটী মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন।”

৮। “এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্ম বিচার ও ধর্ম্মালাপ করিতে পারিবেন।”

৯। “এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না।

মদ্যমাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে।”

এতদ্ভিন্ন এই শান্তি নিকেতন আশ্রমে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রামমোহনরায়ের ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র এবং দেবেন্দ্র নাথের নির্দ্ধারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতে কত মঙ্গলকর এবং কেমন দোষবর্জ্জিত অনুষ্ঠান সকল প্রসূত হইয়া দেশ ব্যাপ্ত করিবে, এই আশ্রম তাহার এক আদর্শ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষির অন্যান্য কর্ম্ম যেমন তাঁহার এক একটী মহদ্বংশোব্যঞ্জক কীর্ত্তিরূপে প্রথিত হইয়াছে,

ইহাও সেইরূপ এক নবোদ্ভাবিত আদর্শ কীর্ত্তি। যেমন এক আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে এদেশে ব্রাহ্মসমাজ নামে বা অপর নামে বা শত শত ব্রাহ্মসমাজ নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তেমনি এক এই আদিম শান্তি নিকে-তন আশ্রমের অনুকরণে শত শত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ঈশ্বরের কৃপায় এই সংসারে সুবুদ্ধি পুণ্যবান্ ন্যায়নিষ্ঠ দানশীল লোকদিগের শ্রীসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকুক। এক দিন সকল সাধু সজ্জনের ঈশ্বর চিন্তার উপযোগী, বিবিক্ত বাসের এইরূপ সম্যক্ অনুকূল, সাধনাশ্রমের অভাব হইবে না।

এক্ষণে এই শান্তি-নিকেতন আশ্রমের সংস্থিতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিলেই আমার কথা শেষ হইবে।

এই মহাপ্রান্তরে শ্রীমন্মহর্ষি দুই একটা মাত্র আরণ্য বৃক্ষকে সখারূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের অনিবিড় ছায়া তলে উপবেশন পূর্ব্বক সচ্ছন্দমনে বরণীয় ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিতেন। সেই ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ একটা সপ্তপর্ণী বৃক্ষের নিম্নে উক্ত মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট আসন এখনো আমরা দেখিতে পাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করি। তাদৃশ তপশ্চরণ সাধারণ লোকের সুসাধ্য নহে। অতঃপর উক্ত মহাত্মার প্রসন্ন দৃষ্টিতে এ স্থানে আর কতকগুলি আরণ্য ও গ্রাম্য বৃক্ষ অর্জ্জিত হইয়া কতক খানি ভূমিকে ছায়া দানে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে।

এই সমস্ত ভূমিখণ্ডই আমাদের দৃষ্টিতে সাধন-আশ্রম। ইহাকে উক্ত মহাত্মা "শান্তিনিকেতন" নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাকে "শান্তিনিকেতন আশ্রম" বলিতে হইবে।

এই আশ্রমের শ্রেণীবদ্ধ পাদপগুলি সুযত্নে প্রতিপালিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বভাবতঃ জলহীন এই কঠিন স্থানে সুগভীর কূপ হইতে বারি উত্তোলিত হইয়া বৃক্ষগুলিকে সজীব রাখে এবং শুষ্ককণ্ঠ শ্রান্ত পথিকের ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য ও সুগন্ধ পুষ্প এবং সুমিষ্ট ফল আগন্তুক গ্রাম্য লোকদিগকে মনোহর উদ্যানদৃশ্য প্রদর্শন করে। তাহাতে তাহাদের চিত্তে চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী কঙ্করময় মরু প্রান্তরের ভাব কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। এক দিকে বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস। মধ্যস্থলে এক দ্বিতল ইষ্টকালয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ঈশ্বরানুরাগী রাজগণেরও উপযুক্ত অভ্যর্থনার যোগ্য রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই আশ্রমের সর্ব্বোত্তর ভাগে বিভিন্ন বর্ণের কাচ দ্বারা রঞ্জিত লৌহবন্ধনীযুক্ত এক প্রশস্ত গৃহ প্রতিষ্ঠিত। এই বিচিত্র গৃহ ব্রাহ্মসমাজ প্রকরণে ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তবর্ণাত্মক সূর্য্যকিরণ এবং সুধাকরের স্নিগ্ধ রশ্মী এই সকল কাচের মধ্য দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক এই গৃহকে অতি চমৎকৃতিজনক করিয়া তুলে।

সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোক আপনাপন্ গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণে স্বীয় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এদেশীয় গৃহস্থদিগের দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ দর্শন করিলে তাহাদের গৃহের ও পরিবারের স্বর্ণমুক্তাদি রত্নরাজির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদাশ্রমের উক্ত উপাসনামন্দিরেও ইহার প্রতিষ্ঠাতার ধন, ঐশ্বর্য্য, সুরুচি এবং তাঁহার দেবমন্দির নির্ম্মাণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর বুঝিতে পারা যায়। এই অপূর্ব্ব শান্তিরসাস্পদ আশ্রমের একপার্শ্বে যেমন দুইটী সপ্তপর্ণী আরণ্য বৃক্ষ শ্রীমন্মহর্ষির সংযম ও তপস্যার সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তেমনি আর এক দিকে, উক্ত তপস্বী কি প্রকার ঐশ্বর্য্য সুখ অবহেলা করিয়া ঐ তপঃসমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও নিদর্শন এই উপাসনা-মন্দিরের সৌন্দর্য্য-ঘটায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

এই উপাসনা-মন্দিরে নিত্য উপাসনা করিবার নিমিত্ত এক পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। তিনি এখানকার আশ্রমধারী। আর এক ব্যক্তির উপর এই আশ্রমাগত সাধকগণের আতিথ্য সৎকার ও সেবার ভার অর্পিত আছে। সম্প্রতি যিনি উক্ত আশ্রমধারী পদে অভিষিক্ত, ইনি পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত; আচারপূত, ব্রত-নিষ্ঠ, শান্ত ও বিনীত স্বভাব। উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্রে ইহার অধিকার আছে।

চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীগণ গ্রামান্তরে যাইবার উদ্দেশে এই মহা প্রান্তরে প্রবেশ করিলে দূর হইতে দেখিতে থাকেন, মুক্তাকাশের মধ্যে এ আশ্রমের উপাসনা মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় স্বর্ণবর্ণে ওঁ ঋতং সত্যং ইত্যাদি বাক্য আকাশভেদী যোগীর ন্যায় পরব্রহ্মের মূলমন্ত্র অস্ফুটস্বরে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছে। শান্তপাদপ আশ্রমের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ সহকৃত সুস্বর বেদপাঠে আশ্রম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নিরাকার নির্ব্বিকার বিশ্ববিধাতার ব্যোমব্যাপী স্তুতিগীতে, সাধু মহাত্মাগণের পবিত্র সমাগমে এবং শ্রান্ত পথিক ও দুঃখার্ত্ত জনের সেবা পরিচর্য্যায় এই আশ্রম যথার্থ তীর্থ লক্ষণ-যুক্ত হইয়া উঠিতেছে।

এই সাধনাশ্রম প্রসঙ্গে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ দানধর্ম্মেরও কিছু উল্লেখ করিতে হয়। নতুবা অঙ্গহীনতা দোষ ঘটে। এ বিষয়ে ক্ষোভ এই যে, বিশেষ তত্ত্ব বলিতে পারিব, এমন সম্ভাবনা নাই। কারণ, উক্ত মহাত্মার অধিকাংশ দানক্রিয়া লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়েও বাহ্য লক্ষণে যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

মুসলমানদিগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থামতে তাহাদিগকে লব্ধ ধনের কিয়দংশ দীন দরিদ্র ও সাধুজনকে অবশ্যই দান করিতে হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে দান ধর্ম্মের এমন

নিয়ম যে, যিনি ভিক্ষাজীবী, তাঁহাকেও তাঁহার ভিক্ষালব্ধ অন্নের কিয়দংশ দীনদুঃখী যাচকগণকে দিতে হয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সারগ্রাহী মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ দান-ক্রিয়ার মর্য্যাদাতেও হিন্দু সম্প্রদায়স্থ কোন ব্যক্তির পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। মহম্মদীয় দান-বিধিও তাঁহার নিকট পরাস্ত। খ্রীষ্টানদিগের পদ্ধতি মতে সামাজিক দান ক্রিয়াতে দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে হস্ত প্রসারণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানানুসারে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথের একপ্রকারে সর্ব্বস্বই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বরের এই প্রিয়সন্তান আপনার বলিয়া কিছু পৃথক্ ধরিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহার ধন চতুর্দ্দিকে অজস্র বর্ষিত হইয়াছে। একবারে শতাধিক ও সহস্রাধিক মুদ্রার দানে বহু বিপন্ন ব্যক্তি আসন্নবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এ দেশের সকল সাধারণ হিতকর কার্য্যের মূলে শ্রীমন্মহর্ষির দান ও অন্যবিধ সাহায্য আছে। তাঁহার দানধন আবশ্যক মত সমুদ্রপারেও যাইতেছে। যে দেশ মারিভয়ে ও দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হয়, সে দেশের লোকের ক্লেশ নিবারণ জন্য শ্রীমন্মহর্ষির দান নানা বিধানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

আমার কথা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। শ্রীমন্মহর্ষির এই সাধনাশ্রমের মূল বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া পূর্ব্বাপর সঙ্গতির নিমিত্ত তাঁহার অমূল্য জীবনের অনেক কথা

অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হইল। যাঁহারা তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের মনে আর কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হইতে পারে।

কেহ বলিবেন, এই আশ্রমের সংস্থাপক শ্রীমন্মহর্ষি এক্ষণে কোথায়? যিনি এক সময় এস্থানে যোগাভ্যাস করিতেন, যিনি এখানে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ভাব হৃদগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি চিরদিন তীর্থবাস করিবেন বলিয়া মধু মক্ষিকার মধু চক্রের ন্যায় এই আশ্রমবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি আর এ আশ্রমে আগমন করিয়া ইহার পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের পক্ষেও পরিব্রজনের ও তীর্থবাসের এক এক কাল নিরূপিত আছে। গুরুর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণান্তর তাঁহারা প্রথম বয়সে তীর্থ পর্য্যটন করেন। শেষ বয়সে বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহারা গুরুর আশ্রমে নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্মহর্ষির শরীরে যত দিন যৌবনের বল ছিল, তত দিন কেহ তাঁহাকে এক স্থানে কিছু দিন স্থির হইয়া থাকিতে দেখে নাই। তখন পরিব্রজনেই তাঁহার পরম সুখ ও সর্ব্বশান্তি অনুভূত হইত। শরীরের শোণিত সতেজ না থাকিলে অতিরিক্ত শীতাতপ ও বর্ষার প্রতাপ সহ্য করিয়া অধ্যাত্ম চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখিতে

পারা যায় না। এই হেতু যতি, তপস্বী ও ঋষিদিগের প্রথম বয়সে চাতুর্ম্মাস্যাদি প্রকরণে এক স্থানে স্থিতি এবং শেষ বয়সে গিরিগুহা ও বৃক্ষবাটিকাদি আশ্রয় করার ও অগ্নি সেবার প্রয়োজন হইত। সেই রূপে শ্রীমন্মহর্ষি জীবনের মধ্যকাল পর্য্যন্ত পরিব্রজন ব্যাপারে রত থাকিয়া পরে নদী ও সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক একটী অপেক্ষাকৃত গ্রাম্যভাববিশিষ্ট স্থলে অবস্থান করিতেন। তাঁহারও পরিচয় দিতেছি।

তিনি বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী বান্দোরা নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় একাদিক্রমে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করেন। এই স্থানে সমুদ্রতীরে এক পুষ্পোদ্যানে তিনি এক আসনোপরি অবস্থান পূর্ব্বক দিবসের অধিকাংশ ভাগ কর্ত্তন করিতেন, তখনকার তাঁহার মনোমত গীত এই :—

'তোমারি এ রাজ্য, ধন ধান্য পূর্ণ শোভাময়।
তোমারি মহিমা গায় সকল ভুবন।

এই সুরম্য স্থানের প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়ে এই গীতের স্ফুর্ত্তি করিয়া দিত।

তাহার পর কয়েক বৎসর শ্রীমন্মহর্ষি চুচুড়ার গঙ্গাতীরবর্ত্তি এক স্থানে ছিলেন। এখানে তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, তাহার অর্দ্ধ ভাগ গঙ্গাজলের উপর এবং অর্দ্ধভাগ কেবল ভূমির উপর! ইহাও এক বিচিত্র

ও অদ্ভূত স্থান। সর্ব্বত্রই মুক্ত আকাশ ও প্রাকৃতিক সুদৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ব্যায়ত থাকিত।

তদনন্তর তিনি দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে গমন করেন। দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে এই তাঁহার দ্বিতীয় বারের বাস। এই সময় তাঁহার বয়স প্রায় সপ্ততি বৎসর।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী এমন একস্থানে অবস্থিত করিতেন, যেখানে প্রশস্ত ময়দান ও তথাকার মুক্তাকাশ তাহার যৌবনের প্রকৃতিদর্শনাভ্যাস কতক বজায় রাখিয়া দিয়াছিল।

এই স্থানে শ্রীমন্মহর্ষির বয়স অশীতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। যেমন জরা ও বার্দ্ধক্য তাঁহার শরীরকে অল্পে অল্পে স্থিরতার দিকে আনিতেছে, তেমনি তিনি নিরুপদ্রব স্থান আশ্রয় করিতেছেন।

সন্ন্যাসীরা পরিব্রজনের পর গুরুর আশ্রমে গুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন। শ্রীমন্মহর্ষিও সেইরূপ গুরুপদাশ্রয় করিয়া এক্ষণে কলিকাতার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে যে, শ্রীমন্মহর্ষির গুরু উপনিষৎ এবং হাফেজের গ্রন্থ। যিনি শ্রীমন্মহর্ষির দর্শন করিতে গমন করেন, তিনি তাঁহার মুখে অবিরত গীতা, উপনিষৎ, অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রীয় শ্লোক এবং হাফেজের বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে

পান। গুরুর ন্যায় ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্প-সহকৃত নিত্য পূজা, নিত্য সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহর্ষির তীর্থবাস ও গার্হস্থ্যধর্ম্মপালন,—দুইয়ের এতদ্রূপ উৎকর্ষ সকলের ভাগ্যে না ঘটিতে পারে। ব্রহ্ম-সাধনার পথে যিনি যত অগ্রসর হউন, তথাপি তাঁহার উপলব্ধি হইবে যে, গন্তব্য পথ এখনো বহুদূর বিস্তারিত। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দিকে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ও প্রসন্ন হউক,—ইহাই ব্রাহ্মসমাজের পরম সাধনা। ইহাই সর্ব্ব-কল্যাণপ্রসূতি। ভারতবাসীগণ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবিতুল্য কবিদ্বাকর রবীন্দ্রনাথের সহিত সর্ব্ব-শাস্ত্রোদিত ব্রহ্মনামে এই গীত গাহিতে থাকুন—

রাগিণী আশা ভৈরোঁ—তাল তেওরা।

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয় শতদল দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন সাগরে জাগিল লহরী লীলা;
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিবিধ বিষয়।

ব্রাহ্মসমাজপরিদর্শন।

তত্ত্ববোধিনী সভার উজ্জ্বল অবস্থায় তৎসভাধিষ্ঠিত দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া কোন কোন ব্যক্তি স্বগণ-পরিবেষ্টিত শৌনক ঋষির প্রাচীন ব্রহ্মসভা স্মরণ করিতেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসরের ভারতীয় ঐতিহাসিক ধর্ম্মবিবরণ এক সূত্রে গ্রথিত দেখা যায়।*

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ কেবল কলিকাতায় সভা আলোকিত করিয়া থাকিতেন, তাহা নহে; কেবল যে নগনদীসাগর দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, তাহাও নহে; পরন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির নিমিত্ত তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে ও গ্রামে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজপরিদর্শন এবং লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনের কথা বলা যাইতেছে।

---

* অধ্যাপক মোক্ষ মূলর ব্রাহ্মসমাজ বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন— "There is, in fact, an unbroken continuity between the most modern and the most ancient phases of Hindu thought, extending over more than three thousand years."

১৭৭৬ বা ১৭৭৭ শকের বসন্ত কালে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে মেদিনীপুর বাসীদিগের মহোৎসাহ জন্মিয়াছিল।*

১৭৮২ শকে কলিকাতার ন্যায় মেদিনীপুরেও ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৮৪ শকের বর্ষাকালে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয় ছিলেন। তদ্বিবরণ ঐ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উক্ত মহোদয়ের প্রেরিত পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে এক এক অংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

* এই দিনের সভার বিবরণ কোথাও প্রকাশিত দেখি না। আমাদের নিজের কথায় তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে হইল।

এই জেলার দক্ষিণ বিভাগের এক রাজার এই নগরস্থ বৃহৎ কুটী বাড়ীতে এই সভা হইয়াছিল। আমার বয়স তখন ১১ বা ১২ বৎসর। জনরবে শুনিলাম, আজি মস্ত এক সভা হইবে; যাহাদের লেখা পড়ায় অধিকার আছে, তাহাদের সকলের এই সভায় যাওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন এই লক্ষণ।—লেখা পড়ায় অধিকার থাকিলেই এই সভায় যাওয়া উচিত। আমিও গেলাম। বৃহৎ সভার এক পার্শ্বে থাকিয়া দেখি, এক সুন্দর মূর্ত্তি সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছেন; মুখ ফিরাইলে চসমা খানি ঝল্ ঝল্ করিতেছে। এ দিন এই পর্য্যন্ত দেখিয়া ফিরিলাম। ৬ বৎসর পরে আমি ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র। তখন উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থ এই মহাত্মার সম্মুখীন হইয়াছিলাম।

"মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকন পূর্ব্বক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোন্-নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার মেদিনীপুর হইতে কর্ম্মানুরোধে অন্যত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাঁহার দ্বারা ১৭৭৩ শকে পুনরুদ্ধৃত ও উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট-রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয়গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজনারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে।

তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহ-মুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই হইবে। এই আশার ভিত্তি-ভূমি তথাকার ব্রহ্মবিদ্যালয়। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি-

য়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আবাস, সেই মেদিনীপুর খণ্ডে। তাহাদের নব উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম তৎপ্রদেশে অচিরাৎ উদ্দীপিত হইবে। এখন হইতেই মেদিনীপুর খণ্ডের পল্লীগ্রামেও ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য্য।

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর কার্য্য।

[শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে যখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করা হয়, তখন মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ "প্রধান আচার্য্য" নামে অভিহিত হয়েন। তদবধি প্রধান আচার্য্য মহাশয় শান্তিনিকেতনের প্রয়াসী। সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতে হইত। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্যভার অপরের হস্তে থাকিত। ১৭৮৭ শকে কেশবচন্দ্র সদলে পৃথক্ হইয়া গেলে মেদিনীপুরস্থিত বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ এই আদিম ব্রাহ্মসমাজের পরিচালন ভার তাঁহার উপর বিন্যস্ত হইল।]

মহাত্মা রাজ নারায়ণ বসু রাজা রাম মোহন রায়ের প্রিয়বন্ধু ৺ নন্দকিশোর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতৃপুণ্যে যেমন হিন্দু কলেজের বিদ্যা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তেমনি তৎকালীন "ইয়ং-বেঙ্গল" দলের চরিত্র-পরীক্ষাতেও

উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত সদ্গুণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল। তিনি নিরভিমান ও বিনীতস্বভাব ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি বিদ্যারসে নিমগ্ন এবং স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। কলেজ পরিত্যাগের পর তিনি শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধীনতায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিতেন। পরে সংস্কৃত কলেজে মাষ্টার হয়েন। তৎপরে মেদিনীপুর ইংরাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় ১৮ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৮৯০ শকে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষসভার সভাপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়।

ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের পরম স্নেহের আস্পদ শীলসম্পন্ন রাজনারায়ণবসু কৃতবিদ্য হইয়া বর্ত্তমান কালের বেথুনকলেজের স্থাপয়িতা বেথুন প্রভৃতি সদাশয় ইংরাজ সুপুরুষদিগের উপদেশে স্বজাতির মর্য্যাদা বর্দ্ধনের পক্ষে সুশিক্ষিত এবং তদর্থে সর্ব্বদা সমুদ্যত ছিলেন। তাহার উপর ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বরনিষ্ঠার যোগে তিনি মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন।

• ১৭৬৮ শক হইতে চারি বৎসর তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার অপর উপদেশ সকল মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা নামে তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকায় ১৭৭৫ শক হইতে মুদ্রিত দেখা যায়। পরে সে-সমস্ত পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া সহস্র ব্যক্তি ধর্ম্মের বিমল আলোক ও পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই পুস্তকাদি দ্বারা যে ধর্ম্মশিক্ষা হইত, তাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের উপদিষ্ট ধর্ম্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট ভাবের সহিত ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বের এমন সংমিশ্রণ ছিল যে, তাহাতে হিন্দুজাতির আবহমান কাল প্রচলিত ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। এখন শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র আদি সমাজের সম্পর্ক ত্যাগ পূর্ব্বক বাইবেলের এমন দোহাই দিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বসূচিত স্বদেশীয় ভাবের বহু ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। এই বিরুদ্ধ ভাবের উপশমার্থ মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সদাশয় ইংরাজগণ অত্রত্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের ইংরাজি প্রসক্তি ছাড়াইয়া তাহাদিগকে জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু এই তথ্য "স্বদেশীয় ভাষানুশীলন" প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। "মেদিনীপুরস্থ বিতর্ক সমাজের বক্তৃতা" নামে এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ১৭৭৮ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়

প্রকাশিত হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথম হিমাচল গমন সময়ে তত্ত্বোধিনী সভায় কি প্রকার বিষয়ের চর্চ্চা হইত, ইহা তাহার এক পরিচয়।

১৭৮১ শকের ১১ই পৌষ তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই সভার পূর্ব্বতন সভ্যদিগের যে জাতীয় ভাব ছিল, এক্ষণে তাহা পুনরুদ্দীপ্ত করিবার প্রয়োজন হইল। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া কয়েক খানি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিলেন। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহারা কেশব চন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই আদি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের তুলনা করিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য বিবাহ আইন দ্বারা দৃঢ় হইয়া গেল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন, আমাদের নূতন সমাজ, আমাদের বিবাহের আইন চাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দু সমাজের চিরদিনের একতা থাকাতে সেই সমাজের সভ্যেরা বলিলেন, হিন্দু বিবাহের যে আইন, সেই তো আমাদের আইন। রাজদরবারে এই বিষয়ে বহু আলোচনা হইল। অবশেষে ১৭৯৩ শকের শেষে, ১৮৭২

খৃষ্টাব্দে, ধর্ম্মব্যতিক্রান্ত এক আইন বিধিবদ্ধ হইল। কেশবচন্দ্র তাহাকেই স্বমতাবলম্বী, ব্রাহ্মদিগের আইন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাপর এক ভাবেই রহিলেন।

জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা।

স্বজাতির এবং স্বদেশের প্রতি প্রেম একটী মহৎগুণ। স্বদেশের প্রতি মমতা দেখাইলে বিদেশীয়েরাও তাহার বিরোধী হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারাও স্বদেশানুরাগী। এই নিমিত্ত সদাশয় ইংরাজগণ আমাদের একপ্রকার হাতে ধরিয়া আমাদিগকে স্বদেশ-প্রিয়তা শিখাইয়াছেন। ইহাই ইংরাজজাতির মহত্ব। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা এই গুণে বিভূষিত ছিলেন। উত্তরোত্তর এই শিক্ষা প্রবল হইলে কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া ১৭৮৮ শকের চৈত্র (মহাবিষুব) সংক্রান্তি দিবসে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) চৈত্রমেলা নামে এক মেলা স্থাপন করিলেন। তাহাতে স্বদেশীয় পণ্ডিত, শিল্পী ও অন্যান্য শক্তিসম্পন্ন সুদক্ষ লোকগণ আপনাপন গুণানুসারে মর্য্যাদা পাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাত্মা গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই উপলক্ষে সুগৃহীতনামা সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে একটী গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে

রচয়িতার কেবল নিজের যশ প্রকাশ পায়, এমন নহে। তাহাতে তাঁহার পুরুষানুক্রমিক পুণ্যফল বিবেচনা হয়। যাঁহার পিতামহ সমস্ত ইউরোপের মহারাজা ও মহারাণীর নিকট সম্মান পাইয়াছিলেন, যাঁহার পিতা মহর্ষিপদ-বাচ্য, আর যিনি স্বয়ং ইংরাজ রাজার নিকট সিভিল-সর্ভেণ্ট পদের উচ্চ মর্য্যাদার প্রথম অধিকারী হইয়াছেন, ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় মহত্ত্বের এইরূপ কীর্ত্তন করিতে পারেন এবং তাহারই মুখে ইহা শোভা পায়—

"ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী শতখনি, রত্নের নিধান।" ইত্যাদি।

এই গীত আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের আদি এবং প্রধান। অতঃপর এই গীতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনি হইতে চলিল।

হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠতা।

হিন্দুত্ব কি এবং তাহার শ্রেষ্ঠতা কি প্রকার, ইহার বিচার সহকারে হিন্দুসমাজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি আপনাদের সুগতি বুঝিয়া লইতেছেন। শ্রীমন্মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যে ও সভাপতিত্বে এই চিন্তার-পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১৭৯০ শকের মধ্যভাগে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বিবাহ আইনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। * তদবধি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এবং সাধারণতঃ সকলে হিন্দুত্বের বিশেষ বিচার করিয়া তদ্ধর্ম্মকে স্বতঃপরতঃ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় গৌরব বর্দ্ধনার্থ যে "চৈত্রমেলা" স্থাপিত হইয়াছিল, এই বৎসর তাহা হিন্দুমেলা নাম পরিগ্রহ করিল। তদবধি আদিব্রাহ্মসমাজের হিন্দুত্ব সকল পক্ষ হইতেই উদ্ঘোষিত হইল। ১৭৯৪ শকের ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠাংশ। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ বক্তৃতা সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই বৎসর হিন্দুধর্ম্মের নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আরো দুইখানি পুস্তক প্রকাশ হইল। তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের নীতি অংশ বিস্তৃত রূপে হিন্দুদিগের রীতি নীতির উৎকর্ষ সাধনার্থ বিবৃত হইল।

এই সময় দেখা গেল, ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ মনিয়র উই-

* Native Marriage Bill Introduced, Sep. 10, 1868.

স্লিম্মস্ এবং মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও ভাষার বিচারে আর্য্য জাতির প্রতি অগাধ ভক্তিমান্ হইয়া উঠিতেছেন।

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর কৃত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা তদানীন্তন বিদ্বজ্জনসমাজের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব্ব ও চমৎকৃতিজনক হইয়াছিল। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর এই বক্তৃতার সার মর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন। স্বদেশে ও বিদেশে হিন্দুদিগের উদারতা, ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং সেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল।

এই বক্তৃতার দেড় বৎসর পরে ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টর আবি নামক ধর্ম্মমন্দিরে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহাও তত্রত্য পণ্ডিত মণ্ডলীকে চমকিত করিয়াছিল। অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যের ন্যায় তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Dean) সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। এতাবৎ আলোচনায় মোক্ষমূলরের হিন্দুভক্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ প্রচারাদি মোক্ষমূলরের কার্য্য।

১৭৬৮ শকে যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বঙ্গানুবাদ সহ ঋগ্বেদ অঙ্কে অঙ্কে প্রকাশ হইতেছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে মোক্ষমূলর ঋগ্বেদ মুদ্রিত করিবার আয়োজন

করিতেছিলেন। তাহার তিন বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম আকারে যখন উপনিষদের মন্ত্রাবলী নিত্য অধীত হইতেছে, সেই সময় (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) ১৭৭১ শকে উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক ঋগ্বেদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ২৬ বৎসরে এই মহা ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের উপদেশে ও চেষ্টায় কাশীতে ঋগ্বেদের হস্তলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। মোক্ষমূলরের এই উদ্যম দেখিয়া তিনি তাহাতে ক্ষান্ত ছিলেন। এক্ষণে এই সুমহৎ কর্য্যের নিমিত্ত তিনি মোক্ষমূলরকেই যশোভাগী করিলেন। *

মোক্ষমূলর প্রথমে বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে

---

* এতন্নিমিত্ত আদি ব্রহ্মসমাজ হইতে পণ্ডিত মোক্ষমূলর যে অভিনন্দন্ পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"It comes from the Adi Brahma Samaj. * * 'The Committee of the Adi Brahma Samaj beg to offer you their hearty congratulations on the completion of the gigantic task which has occupied you for the last quarter of a century. By publishing the Rig-Veda at a time when Vedic learning has by some sad fatality become almost extinct in the land of its birth you have conferred a boon upon us Hindus, for which we can not but be eternally grateful.'

জড়োপাসক বলিতেন। অপর এক জর্ম্মণ পণ্ডিতের (ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি মন্দিরের) এক বক্তৃতার সমালোচনা উপলক্ষে মোক্ষমূলর ব্রাহ্মধর্ম্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, তবে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পৌত্তলিকতা নয়; উহা উচ্চতম পরমাত্মোপাসনা loftiest spiritual worship. এখন তিনি পূর্ব্ব কথার প্রতিসংহার করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মরে নাই, উহা সঞ্জীবিত। *

ক্রমশঃ উক্ত ভট্ট অধ্যাপক মহাশয় এদেশীয় ব্রাহ্মণাধ্যাপকদিগের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে মোক্ষমূলর দিব্যলোকবাসী। শেষ কালে তিনি আমাদের পক্ষে একটী বিষয়ে মহোপকার করিয়াগিয়াছেন। ইংরাজ দিগের সহিত সদ্ভাব আমাদের পরম সুখ ও সৌভাগ্যের মূল। যুবা ইংরাজগণ এদেশের কোন না কোন প্রধান

---

* "Then I withdraw my expression that Brahminism is dead." মোক্ষমূলর বলিতেন, মনূক্ত চতুর্থাশ্রমিক সন্ন্যাসবিধি উক্ত ধর্ম্মের আদর্শ মাত্র। উহা ব্যবহারে আইসে নাই। কিন্তু মনিয়ার উইলিয়মস্ তাঁহার Brahminism and Hinduism গ্রন্থে বর্ত্তমান সময়ের এক সন্ন্যাসীর (দণ্ড, কমণ্ডলু ও আসনাদি সমেত) চিত্র দিয়াছেন। এই সন্ন্যাসী ইংরাজগবর্ণমেণ্টের C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত এবং এক বৃহৎ রাজসংসারের দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্ব নাম গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর, সি, এস, আই; সম্প্রতি স্বামী শ্রীসচ্চিদানন্দসরস্বতী।

পদ লইয়া আসিবার সময় এরূপ সংস্কারাপন্ন থাকেন যে, এদেশে তাঁহাদের আসা এক প্রকার নির্ব্বাসন; কারণ, তাঁহাদের মতে, এই অসভ্য দেশের লোকেরা নীতিহীন, সাহিত্যহীন এবং উন্নতি-চেষ্টা-বিহীন। মোক্ষমূলর What India can teach us ? এই গ্রন্থে উক্ত সংস্কারের খণ্ডন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়ের সহিত মোক্ষমূলরের কথোপকথন স্মরণ হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পারিস নগরে সর্ব্বগুণাধার উক্ত ঠাকুর মহোদয় এতদ্দেশীয় সঙ্গীতালাপ প্রসঙ্গে ভট্ট মহাশয়কে বলিয়াছিলেন।:—

"You despise whatever is strange to you, whether in music, or philosophy, or religion; you will not listen and learn, and we shall understand you much sooner than you will understand us." *

প্রায় ৩০ বৎসর পরে এই মর্ম্মের কথা ভাবী সিবিলিয়ান ইংরাজ যুবকদিগের প্রতি জর্ম্মন পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা উক্ত হইল।

---

* Chips, &c. Vol. IV. p. 374.

আর্য্যসমাজের সহিত সম্পর্ক।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেব এক্ষণে আর্য্যসমাজের কোন কোন ধর্ম্মবক্তাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উপদেশ দিতে অনুমতি করেন। ইহাতে এই সমাজে নিঃসম্পর্কীয় ভিন্ন সমাজের লোকের সমাগম বিবেচনা করা যাইবে না। আর্য্য সমাজ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের দ্বারাই সংস্থাপিত, ইহা ঐ আর্য্য সমাজের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুন (১৭৯৯ শকের আষাঢ়) বৃহস্পতিবারে লাহোর নগরে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হয়। দয়ানন্দের চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন, "পুরাতন মন্দিরের উপকরণাদি লইয়া যেমন নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উপকরণাদি লইয়াই লাহোরের আর্য্যসমাজ বিরচিত হইল।" সেই দিবস "ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই উহাদের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।"

অনার্ষ বেদভাষ্য দ্বারা নূতন ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করার প্রতি দয়ানন্দ স্বামীর গুরু বিরজানন্দ স্বামীরও অনুমোদন ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে একটী সমাজ স্থাপনের পক্ষে দয়ানন্দের এবং তাঁহার ব্রাহ্ম শিষ্যদিগের ইচ্ছা প্রবল হইলে আর্য্য সমাজের উৎপত্তি হইল।

এ অবস্থায় আর্য্যসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের একতা ও সদ্ভাব স্থাপন হওয়া সঙ্গত বিবেচনা হয়। *

স্বামী দয়ানন্দ নূতন বেদভাষ্য দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাব সারার্থ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা চিব দিন ঘোষিত হইতেছে। ১৭৬৯ শকে (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙ্গালা অর্থ সমেত যে ঋগ্‌বেদ প্রকাশিত হয়, তাহার ভূমিকাতে লিখিত আছে;— "সূর্য্যেব অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুব অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি বায়ু দেবতা।" ইত্যাদি। স্বামীজী 'সত্যার্থপ্রকাশ' গ্রন্থ দ্বাবা ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্তুতি বন্দনাব যে শিক্ষা দিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থদ্বারা তাদৃশ শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে হৃদগত করিয়া নিতান্ত যুবা বয়সেই সত্যেন্দ্রনাথ বেদার্থসিদ্ধ এই গীত রচনা করিয়াছিলেন,—

গাও তাঁরে গাঁও সদা তরুণ ভানু
যবে অচেতন জাগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

---

* শ্রীমন্মহর্ষির এক পৌত্র ৺ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সদ্ভাব বর্দ্ধন বিষয়ে পরম যত্নবান্ ছিলেন। এতন্নিমিত্ত পঞ্জাবে গিয়া বহু পরিশ্রম করাতে তাঁহার ক্ষীণ শরীর অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮২১ শকের ৩ ভাদ্র তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কেবল শ্রুতিবাক্য দ্বারাও ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিয়া আসিতেছেন।

থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়।

যদি ইতিবৃত্ত বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজ যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সমুদ্ভূত, তাহা বলা দুষ্কর হয়। অতএব ইতিহাসক্ষয় দোষ সর্ব্বথা পরিহরণীয়। বিশেষতঃ প্রতীতি হয় যে যদি সাধুতায় অনুরাগ জন্মে, তবে পৃথিবীর সকল সাধুলোকদিগের গুণগরিমা জানিতে অবশ্য আগ্রহ হইবে। ইতিহাস প্রকরণে দশ দিক্ হইতে সংবাদ আসিলে তবে পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও পুণ্য বিদিত হইবে। এমন হইলে তবেই সমগ্র পাপের প্রশমন ও পুণ্যপথের বিস্তার হইতে পারিবে। আর তাহাতে বিধাতার বিচিত্র বিধানের ও নিত্য কল্যাণের পরিচয় হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত আর্য্যসমাজের সম্পর্ক দেখা গেল। এক্ষণে আর্য্যসমাজের সহিত এদেশের থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অনুধাবন করা যাইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ ম্যাডেম্ ব্লাভিস্কি ও কর্ণেল অল্‌কট্ থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আর্য্যসমাজ স্থাপনের কয়েক মাস পরে তাহার সংবাদ পাইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের

১৮ ফেব্রুয়ারি কর্ণেল সাহেব নিউইয়র্ক হইতে অতিশয় বিনয়ের সহিত আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা দয়ামন্দ স্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখেন। নিউইয়র্ক দেশের থিওসফিষ্ট কাউন্সলের ২২ মে দিবসীয় সভায় এই দুই সভাকে একত্র করিবার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবিত নাম The Theosophical Society of the Arya Somaj of India. ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কর্ণেল ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমেই দয়ানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাত করেন। কয়েক দিন ধরিয়া বেদের আলাপ হয়।

আদিম বেদশাস্ত্রে যে যোগচর্য্যার বিধিব্যবস্থা আছে, তৎ সন্ধান প্রাপ্তির নিমিত্ত থিওসফিষ্টদিগের এই আগ্রহ। তাঁহারা প্রথমতঃ স্বামীজীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্যে এদেশে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা আপনারাই যোগাচার্য্য হইয়া উঠিলেন। দয়ানন্দের সহিত সম্পর্ক হ্রাস হইতে লাগিল। পরে স্বামীজী আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বোম্বাই নগরে এক বিরাট সভা সমাবেশ পূর্ব্বক থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত আর্য্যসমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ করিলেন।

অতঃপর আর্য্যসমাজের সহিত থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রভেদলক্ষণ পরিস্ফুট হইল। আর্য্যসমাজ কেবল বেদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলেন এবং শ্রীমদ্দয়ানন্দ স্বামী বিরচিত ভাষ্য অনুসারে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন; থিওসফি-

ষ্ঠেরা সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্বমত রক্ষা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিজ্ঞান-সম্মত যোগতত্ত্বের উদ্ভাবন, অনুধ্যান ও তাহার সাধনা করেন।

নানা সম্প্রদায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইয়ুরোপ ও এসিয়া দেশের প্রচারিত ধর্ম্মের আলোচনায় এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারে সম্প্রতি ভারতে নানা প্রকার ধর্ম্মমতের সংস্থাপন, মহোৎসাহে সেই সকল মতের প্রচার এবং বিবিধ সদনুষ্ঠান হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হীনাবস্থ ভারতবাসীদিগের আলস্য, অজ্ঞান ও মোহনিদ্রা ভঙ্গের নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন। তাহা অনেক অংশে সফল দেখাযায়। এক্ষণে প্রবুদ্ধ ভারতবাসীকে ব্রাহ্মসমাজের মূল কথা স্মরণ করাইতে হয়।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী থাকিয়াও মোক্ষ মুলর বলিয়াছেন,—
We want less of creeds, but more of trust; less of ceremony, but more of work; less of solemnity, but more of genial honesty; less of doctrine, but more of love.

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের দীর্ঘ জীবনের বিপুল চেষ্টায় সারাৎসার বিচারে ঐ সত্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত যত্নে ও পরিশ্রমে যিনি জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পুরাতন

অথচ চিরনূতন একটী সঙ্গীত প্রবুদ্ধ ভারতবাসীর শ্রবণ-গোচর করিবার ইচ্ছা করি। সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত পরমাং তত্ত্বের সারভূত কথা এই একটী গীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

(রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।)

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর, সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে
রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া,
যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥

ব্রাহ্ম-সম্মিলন।

সম্মিলন ব্রাহ্ম লক্ষণ। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিলেন, তদ্দ্বারা অন্য কোন সমাজের বা সম্প্রদায়ের ভঙ্গের কোন ভয় থাকিল না। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম "সমদর্শী" হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, মতের বিচারে যত ভিন্নতা হউক, তদ্বিষয়ে সঙ্কোচ করিব না, কিন্তু সদ্ভাবে এক হইব। ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (১৮৭৪ নবেম্বর) মাস হইতে "সমদর্শী বা Liberal" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতে

সেই ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনভাবে চিন্তা ও তত্ত্বালোচনা করিবার পথ প্রশস্ততর হইল। তদবধি ব্রাহ্মেরা মতভেদ সত্ত্বেও সদ্ভাবে সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল ব্রাহ্মের আশ্রয়স্থান। তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনে তাঁহারা এই গীত গাহিয়াছিলেন—

আয় আয় ভাই, গাইরে সকলে,
প্রেমের মহিমা, অনন্ত অসীমা;
আয় আয় গাই জয় ব্রহ্ম বলে।

"জয় ব্রহ্ম" এই মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র মুমূর্ষু ভারতের কর্ণে যিনি প্রথমে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার নামে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন-বিধি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৩৬ শকে রামমোহন রায় একদিন যে বাড়ীতে আসিয়া শ্রুতকীর্ত্তি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন, ৬৪ বৎসর পরে ১৮০০ শকে সেই গৃহে উক্ত মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মেরা ব্যবস্থাপূর্ব্বক সম্মিলিত হইলেন এবং সকলকেই সদ্ভাবে সম্বোধন করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদের বৃদ্ধি হইল এবং পুনশ্চ এক ভিন্ন সমাজের পত্তন হইল। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামে এবং ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের বিশুদ্ধ প্রেমের আকর্ষণে সকলে পুনঃপুনঃ সম্মিলন সুখ অনুভব করিতে থাকিলেন।

ঠাকুর পরিবার।

কলিকাতায় ঠাকুর পরিবার প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চতুর্ব্বিভাগেই ঠাকুর বাবুদিগের জমিদারী আছে। তাঁহাদের প্রজাবর্গ সুশাসিত ও সুপালিত। এই রাজধর্ম্মে ইংরাজদিগের রাজদরবারেও ঠাকুর বংশীয়দিগের সুযশ প্রথিত রহিয়াছে। শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথের পিতা সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ সভাপ্রকরণে ইংরাজ-রাজ-শাসনের অনুকূলতা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তদ্বিষয়ে চিরদিন এই ঠাকুর বংশীয়েরাই বঙ্গবাসীদিগের অগ্রণী। কেবল রাজনীতি বিষয়ে কেন? এ দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে ঠাকুর পরিবারের কোন না কোন মহৎ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্টিগোচর হয়।

ঠাকুরবংশ বেদবিৎ ভট্টনারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত। এ বংশের সুধন্য সন্তান দেবেন্দ্রনাথ এই বাক্যে পূর্ব্বপুরুষগণের অর্চ্চনা করেন—

'পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ বলরামাদ্ধরিহরঃ হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ মহেশাৎপঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমণের্রামলোচনঃ রামলোচনাদ্দ্বারকানাথঃ—নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।'